মাসুদ রানা

গুপ্তঘাতক

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

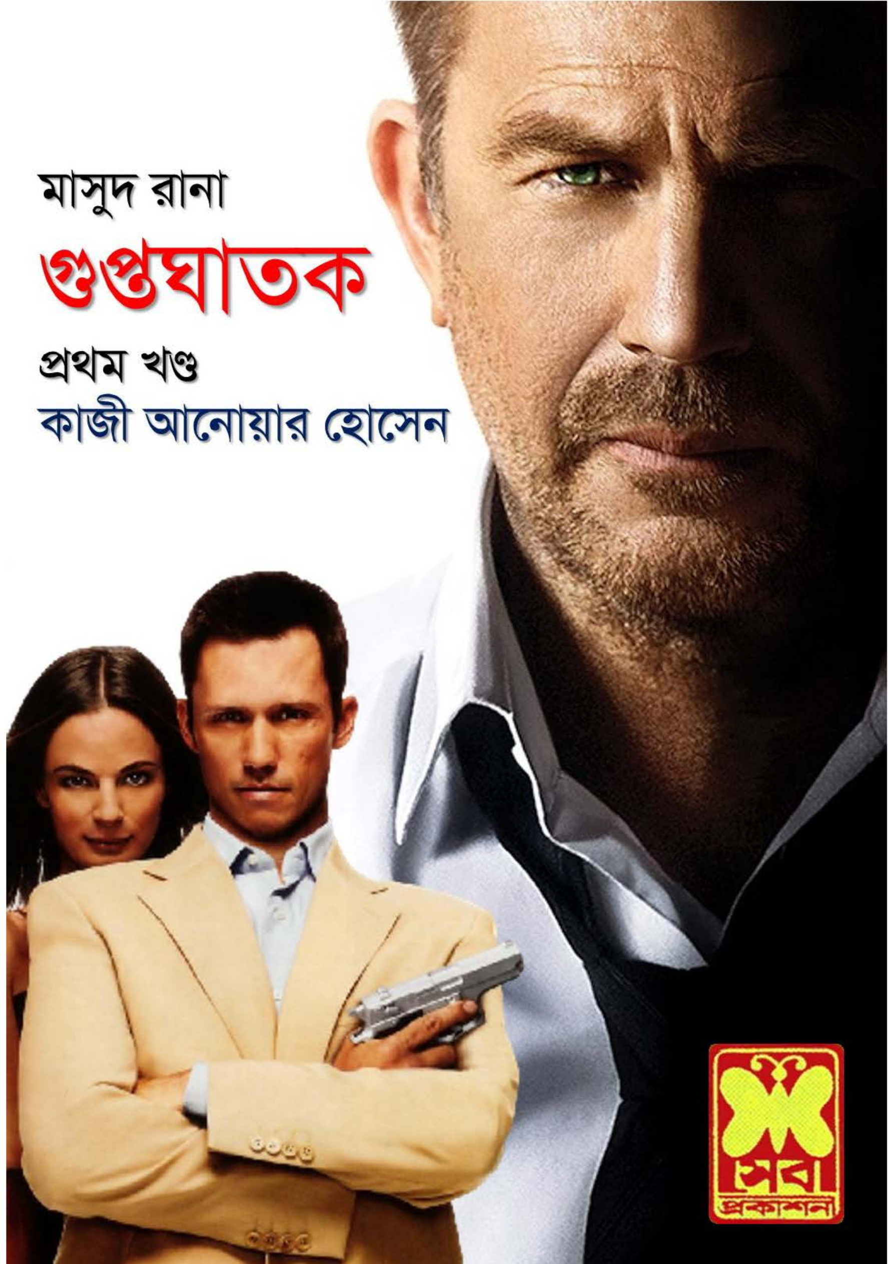

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

গুপ্তঘাতক

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বেনি পেলেডের পিছু লেগেছে ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্টি ক্রাইম অর্গানাইজেশনের স্ট্রাইক ফোর্সের বর্তমান চীফ, মাসুদ রানা।

ও জানে না ভেতরে ভেতরে কী ভয়ংকর খেলা চলছে ওকে নিয়ে।

ওর প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে আগে ভাগেই কী করে যেন জেনে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ।

মরিয়া হয়ে আফ্রিকা ছুটল মাসুদ রানা রহস্য উদঘাটনের জন্য।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ২১০

গুপ্তঘাতক ১

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

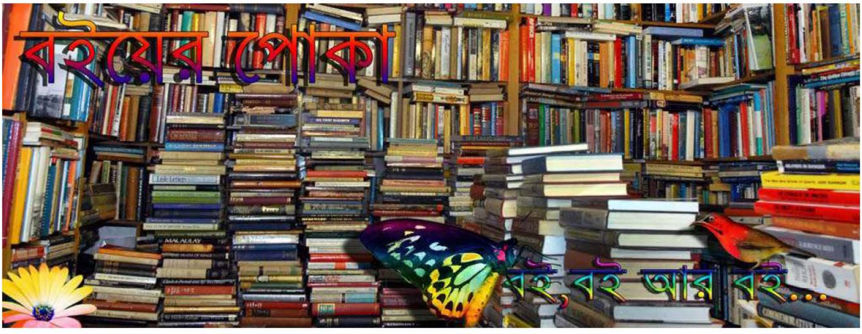

মাসুদ রানা-২১০

গুপ্তঘাতক ১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7210 3

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-210
GUPTOGHATOK
Part-I
By: Qazi Anwar Husain

তেইশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়
মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস
ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন
বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ
যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা
যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান

এক

বৈরুত। বিলাস নগরী বৈরুতে সন্ধে নেমেছে আধঘণ্টা আগে। আজকাল অবশ্য বিলাস নগরী বলা হয় না বৈরুতকে, বিশেষণ পাল্টে গেছে। বলা হয় ধ্বংস্তূপের নগরী। তবে মানুষের ব্যস্ততার কমতি নেই। ট্রাফিকের চাপে এ মুহূর্তে বৈরুত ভারাক্রান্ত। ফলে জায়গামত পৌঁছতে মিনিট দশেক দেরি হয়ে গেল।

পিছন থেকে কাঁধে টোকা পড়তে ট্যাক্সি দাঁড় করাল ড্রাইভার। দুলে উঠল গাড়ি, নেমে পড়েছে প্যাসেঞ্জার। দীর্ঘদেহী এক যুবক। পরনে কফি রঙের কমপ্লিট, ক্রিমসন টাই, সাদা শার্ট। পায়ে লিজার্ড স্কিনের তৈরি চকচকে শু। হাতের আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল মাসুদ রানা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

চিড়বিড় করছে গায়ের মধ্যে। নিউ ইয়র্ক আর বৈরুতের আবহাওয়ায় কী আকাশ পাতাল তফাত ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সি বিদেয় করল রানা। ট্যাক্সির বিলীয়মান ব্যাক লাইটের আলো দৃষ্টিসীমার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়, তারপর উঠে পড়ল ব্যস্ত ফুটপাতে। পথচারীদের ধাক্কা এড়াতে এঁকেবেঁকে ফুটপাত অতিক্রম করল ও, একটা কাঁচের সুইংডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ছোট একটা বার। পেলিক্যান। প্যালিক্যানের মালিক আহমেদ

ফৈয়াজ। ফিলিস্তিনী। লেবানীজ পুলিসের ইনফর্মার সে। এদিক ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। কিছুই বদল হয়নি ভেতরের, সব আগের মতই আছে। ব্রিটিশ আমলের বড় দুটো প্রপেলর ফ্যান মন্থর বেগে ঘুরছে মাথার ওপর। চেয়ার-টেবিল, বার কাউন্টার, সব পুরানো। খদ্দেররা প্রায় প্রত্যেকেই বিদেশী সাংবাদিক। রঙীন পানীয় এবং কলগার্ল, দুই নিয়ে ব্যস্ত।

ধীর পায়ে বার কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। একটা উঁচু টুলে বসে পড়ল। ওপাশে পানীয় ঢালার কাজে ব্যস্ত আহমেদ ফৈয়াজ। কাজ সেরে হাসিমুখে নতুন খদ্দেরের দিকে ফিরল সে। রানাকে দেখে পলকের জন্যে হোঁচট খেয়ে আবার বহাল হলো হাসিটা। 'কি দেব আপনাকে, স্যার?'

'ঠাণ্ডা বীয়ার, প্লীজ।'

'শিওর!' ঝুঁকে কাউন্টারের নিচের ছোট্ট ফ্রিজ থেকে এক বোতল বাডওয়েজার বের করল ফৈয়াজ। একটা গ্লাসসহ বোতলটা এনে রাখল রানার সামনে। নীরবে বীয়ার পান করতে লাগল ও। অন্যমনস্ক। অন্য খদ্দের আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফিলিস্তিনী, কিন্তু কাজের ফাঁকে বারবার আড়চোখে তাকাতে লাগল মাসুদ রানার দিকে।

দু চোখ গর্তে বসা। নিচে গভীর কালির পোচ। মণির পাশে সাদা জমিনে সূক্ষ্ম লাল লাল শিরা জেগে আছে—অনেকদিন ঠিকমত ঘুম না হওয়ার লক্ষণ। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। রানার গ্লাস ধরা হাতটা যেন পাথর কেটে তৈরি। শূন্যে স্থির। নিষ্কম্প। কাঁচের গায়ে জমে ওঠা শীতল স্বেদবিন্দু দেখছে ও আনমনে। দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে আছে।

ডানে-বাঁয়ে দেখে নিল আহমেদ ফৈয়াজ। কাউন্টারের দুই প্রান্তে দুই কলগার্ল ছাড়া রানার ধারেকাছে এ মুহূর্তে আর কেউ নেই। 'খুক' করে কাশল সে রানার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। 'অনেকদিন পর আপনাকে

দেখলাম। কেমন আছেন, স্যার?'

'ভাল আছি। ধন্যবাদ, ফৈয়াজ। তুমি কেমন?'

বিনয়ে গলে গেল যুবক। 'ভাল আছি, স্যার। ভাল আছি।' দাঁত বের করে হাতে ধরা গ্লাস মোছা ন্যাকড়াটা আঙুলে পেঁচাতে শুরু করল। হঠাৎ কি খেয়াল হতে ঘড়ির দিকে তাকাল সে। 'আর দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে বারাক, স্যার। ঠিক আটটায়।'

সরাসরি ফিলিস্তিনীর দিকে তাকাল মাসুদ রানা। দেখে মনে হলো যেন বিরক্ত হয়েছে। 'তুমি কি করে জানো ওর জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ফৈয়াজ। হাতের কাজ থেমে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, 'না, মানে, আপনার পুরানো বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র উনিই রোজ আটটায় একবার আসেন এখানে। একদিনও মিস করেন না। তাই অনুমান করে বললাম।'

ডানদিকের মেয়েটির ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। যেন ওর তাকানোর অপেক্ষায়ই ছিল, অদ্ভুত এক আমন্ত্রণের ভঙ্গি করে হাসল মেয়েটি। টুল থেকে নেমে পড়ার উদ্যোগ নিল। কিন্তু থেমে গেল রানার চাউনি বদলে যেতে দেখে। উঠে দাঁড়াল রানা। একটা দশ ডলারের নোট বাড়িয়ে ধরল ফৈয়াজের দিকে।

'এটা রাখো।'

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা করুণ হয়ে উঠল ফৈয়াজের। 'রাগ করলেন, স্যার?'

'রাগ! কেন?'

রানার চোখে কৌতুকের আভাস পেয়ে সাহস ফিরে পেল যুবক। 'তাহলে আজকের দামটা নাহয় না-ই দিলেন, স্যার।' আবার আঙুলে ন্যাকড়া পেঁচানো শুরু হলো তার।

সময় নষ্ট করল না মাসুদ রানা। ফৈয়াজের এই দিকটা খুব ভাল জানা

আছে। জোরাজুরি করতে গেলে উল্টে মন খারাপ হয়ে যাবে ওর। নোটটা পকেটে ফেরত পাঠাল রানা। গ্লাস আর বোতল নিয়ে সদ্য খালি হওয়া একটা টেবিলের দিকে পা বাড়াল। 'বারাক এলে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো।'

'জ্বি, আচ্ছা,' মাথা দোলাল ফিলিস্তিনী। পিছন থেকে চেয়ে থাকল রানার ঋজু পিঠের দিকে। অনেক আগে থেকেই ওকে চেনে সে। পুলিসে চাকরির সুবাদে দুয়েকবার রানার সঙ্গে ছোটখাট কাজ করার সৌভাগ্যও হয়েছে। তাই তার মন বলছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে ফৈয়াজ, যতবারই মাসুদ রানাকে দেখা গেছে বৈরুতে, প্রায় প্রতিবারই কিছু না কিছু ঘটেছে। তাছাড়া রানার চেহারাও সেরকম ইঙ্গিত-ই দিচ্ছে।

পেলিক্যানে প্রবেশপথের দিকে মুখ করে বসল মাসুদ রানা। তলানিটুকু গলায় ঢেলে আবার ভরে নিল গ্লাস। কানের কাছে সুড়সুড়ি লাগছে। ঘামে ভিজে গেছে চুল। রুমাল বের করে কপাল মুখ মুছল রানা। ভালই গরম পড়েছে। ঠিক ঢাকার ভাদ্র মাসের গুমোট গরমের মত। ঢাকার কথা ভাবতে বসল মাসুদ রানা। মুহূর্তে হারিয়ে গেল অতীতে।

ঢাকা ছেড়েছে ও দু মাস হয়ে গেছে। ছুটিতে আছে। ছুটি আসলে কাগজে-কলমে। নতুন এক বিশেষ দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের (অবসরপ্রাপ্ত) নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি নিতে হয়েছে রানাকে বিসিআই থেকে। খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে রানার সময়টা। দম ফেলারও ফুরসত পায়নি।

এই ছুটি নেয়ার নির্দেশ যেদিন পায় ও, সেদিন ডাক পড়েছিল রাহাত খানের রুমে। রানা ঢুকতেই বসতে ইঙ্গিত করলেন বৃদ্ধ। পুরু মসৃণ কাগজে টাইপ করা একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আগে এটা পড়ে দেখো। তারপর আলোচনা করা যাবে।'

কৌতূহলী হয়ে চিঠিটা নিল মাসুদ রানা। ওটার ওপরে জাতিসংঘের সুদৃশ্য মনোগ্রাম দেখে আরও বেড়ে গেল কৌতূহল। স্বয়ং জাতিসংঘ মহাসচিব স্বাক্ষরিত চিঠি, লেখা রাহাত খানকে উদ্দেশ্য করে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল রানা। চিঠির সার বক্তব্য ছিল এরকমঃ ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্টি ক্রাইম অর্গানাইজেশন বা ইউ এন এ সি ও-র স্ট্রাইক ফোর্সের পরবর্তী মেয়াদের অধিনায়ক মনোনয়নের জন্যে সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক্সট্রা অর্ডিনারি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উক্ত পদের জন্যে বিসিআই অপারেটর মেজর মাসুদ রানার নাম প্রস্তাব করা হয় এবং প্রস্তাবটি অবিশ্বাস্যভাবে সর্বসম্মত রায় লাভ করে। পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্য ব্রিটেনের পক্ষ থেকে জনাব মাসুদ রানার নাম প্রস্তাব করা হয়।

পদটি দু বছর মেয়াদী। বলা বাহুল্য, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বপূর্ণ একটি পদ। পরিষদের সর্বসম্মত রায়ে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে মাসুদ রানাই এ পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্ব পাওয়ার সৌভাগ্য হলে স্ট্রাইক ফোর্স তথা বিশ্ব মানবতা বাংলাদেশের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

পর পর দুবার পড়ল রানা চিঠিটা। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম গঠন করেন এই সংগঠন যা সংক্ষেপে ইউনাকো হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র জড়িত আছে এর সঙ্গে, যদিও অর্গানাইজেশনের কর্ম পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য।

বিশাল ইন্টেলিজেন্স নেটওয়র্ক আছে ইউনাকোর। পৃথিবীর সর্বত্র শাখা-প্রশাখা আছে এর। সিআইএ কেজিবি সাইফার এসআইএস, বিসিআই মোটকথা বিশ্বের নামকরা প্রায় সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত

আছে এই নেটওয়র্কের সঙ্গে। প্রয়োজনের সময়ে নিজস্ব অপারেটরদের দিয়ে ইউনাকোর কাজ উদ্ধারে সহায়তা করতে হয় তাদের কখনও কখনও। অন্য সময় নিজেদের মধ্যে যতই সন্দেহ-অবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতা-হানাহানি থাক না কেন, ইউনাকোর ডাক এলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যায় তারা। সবাই সবার বন্ধু এখানে। মাসুদ রানা নিজেও কায়েকবার কাজ করেছে ইউনাকোর হয়ে।

এর পাশাপাশি রয়েছে স্ট্রাইক ফোর্স। পৃথিবীর সেরা কম্যাণ্ডোদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশজন বাছাই করা কম্যাণ্ডো নিয়ে এই বাহিনী গঠিত। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনে বিশ্বের যে কোন স্থানে শক্তি প্রয়োগের অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে এর।

শুরুতে এত ক্ষমতা ছিল না স্ট্রাইক ফোর্সের। তখন কোন দেশে অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দিলে সে দেশের অনুমতি নেয়ার বিধান ছিল। যথেষ্ট সময় ব্যয় হত এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করতে। ফলে যাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার অনুমতি চাওয়া, বিপদের গন্ধ পেয়ে চট্ করে প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রে সরে পড়ত তারা নির্বিঘ্নে। বেশ কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটার পর বাতিল করে দেয়া হয় এই নিয়ম।

ইউনাকোর একটিই উদ্দেশ্য, 'টু অ্যাভার্ট, নিউট্রালাইজ অ্যাণ্ড/অর অ্যাপ্রিহেণ্ড ইনডিভিজুয়ালস অর গ্রুপস এনগেজড ইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল অ্যাকটিভিটিজ'। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে আরম্ভ হয় সংগঠনের কার্যক্রম। সদর দফতর নিউ ইয়র্কে, জাতিসংঘ ভবনের বাইশ তলায়।

চিঠিটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল মাসুদ রানাকে। কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। নিজেকে স্ট্রাইক ফোর্সের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললে বিসিআই বা রানা এজেন্সির কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। সম্ভবই হবে না হয়তো। আবার এরকম লোভনীয় একটা প্রস্তাব এড়িয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা

করাও এক কথায় অসম্ভব। সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলেন ওকে রাহাত খান।

'কি ভাবছ!'

নিজের ভাবনা প্রকাশ করল মাসুদ রানা। 'সময় বড় ফ্যাক্টর, স্যার। ওদের সঙ্গে ফুল টাইম এনগেজড্ হয়ে পড়লে বিসিআই বা এজেন্সির কাজ করার সুযোগ পাব কি না ভাবছি।'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। এই চিঠি পাওয়ার পর মহাসচিব, ইউনাকো চীফ, ডেপুটি চীফ, সবার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি আমি, আনঅফিশিয়ালি। ওঁরা সবাই আশ্বাস দিয়েছেন অবসরে এসব কাজ তুমি করতে পারবে। অবশ্য বড় ধরনের কোন অ্যাসাইনমেন্ট হলে খানিকটা অসুবিধে হবে হয়তো। তবে তারও বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। হাতে সে সময়ে ইউনাকোর কাজ না থাকলে ছুটি নিয়ে সেটাও সারতে পারবে। স্ট্রাইক ফোর্স এমনিতেও তেমন ব্যস্ত নয়। আমার মনে হয়, ওদের কাজ করেও যথেষ্ট অবসর থাকবে তোমার। সবচে' বড় কথা, এরকম একটা পজিশন...ইউনাকো চীফ, ডেপুটি চীফ, সবাই তোমার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন। তুমি বরং রওনা হয়ে যাও, রানা। ছুটি নাও অনির্দিষ্টকালের জন্যে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

তিন দিন পর নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে উড়াল দিল মাসুদ রানা। কাজের পরিবেশ কেমন হবে ভেবে খানিকটা চিন্তায় ছিল ও। কারণ এবার আর অন্যান্যবারের মত দায়িত্ব নিয়ে তা পালনে বেরিয়ে পড়া নয়, সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করতে হবে ওখানে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে পা রাখামাত্র চিন্তামুক্ত হয়েছে রানা ওকে সংবর্ধনা জানানোর ইউনাকোর ঘটা দেখে। স্ট্রাইক ফোর্সের প্রতিটি সদস্য উপস্থিত ছিল তাদের নতুন চীফকে বরণ

করার অনুষ্ঠানে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

ইউনাকো প্রধান মাইকেল ফিশার এবং উপ-প্রধান লিওনিদ কলচিনস্কি, দুজনকেই চমৎকার মানুষ মনে হয়েছে রানার প্রথম দর্শনেই। ইউ এস নেভির কর্নেল ছিলেন ফিশার। কলচিনস্কি ছিলেন কেজিবি-র অপারেশনস উইঙের (আমেরিকা) প্রধান। ষাটের নিচে নয় ওঁরা কেউ। মাসুদ রানার সুযোগ সুবিধের ব্যাপারে দুজনেরই তীক্ষ্ণ নজর। ওর ব্যাপারে অল্প-বিস্তর জানা আছে দুজনেরই। তারওপর, এবারই প্রথম এই পদটির জন্যে যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ের বেলায় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি ঘটল। কাজেই এটাই স্বাভাবিক।

জয়েন করার পরদিন ছিল রোববার। সোমবার থেকে পুরোদস্তুর কাজে লেগে পড়ল মাসুদ রানা। বিশ্বের সেরা কম্যাণ্ডোদের নিয়ে টানা দু সপ্তাহ চলল কঠোর অনুশীলন, রোজ গড়ে চোদ্দ ঘণ্টা করে। এরপর আরও কিছু জরুরী কাজ সারতে হলো। এতেও এক সপ্তাহ ব্যয় হলো। এবং এর পরপরই এল স্ট্রাইক ফোর্সের হয়ে প্রথম ফিল্ড অপারেশনের ডাক।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, কায়রোর গিজেহ্ এলাকায় 'নিউ জাহিদ' নামে এক চরম ডানপন্থী গুপ্ত সংগঠনের কিছু সদস্য বিভিন্ন অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সূত্রমতে, ট্রেনিঙের ধরন দেখে বোঝা যায় বড় একটা কিছু ঘটতে চলেছে মিশরে। অতীতে ইসরায়েলের সঙ্গে 'ক্যাম্প ডেভিড' চুক্তি স্বাক্ষর করার 'অপরাধে' প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছিল এই নিউ জাহিদ। গোঁড়ামির ব্যাপারে মুসলিম ব্রাদারহুডদের চাইতেও কয়েক কাঠি বাড়া এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠনটি।

সূত্র এ-ও নিশ্চিত করে, বেনি পেলেড নামে এক ইহুদী সন্ত্রাসী তাদের এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এর ব্যাপারে কমবেশি জানা ছিল মাসুদ রানার। তেল আভিভের বেশ নামডাকওয়ালা এক স্কুল শিক্ষকের একমাত্র

সন্তান সে। স্কুল জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। পরে মেডিসিনের ওপর পড়াশুনার জন্যে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় বেনি পেলেড।

কিন্তু ওখানে অল্পদিনের মধ্যেই কুসংসর্গে পড়ে বখে যায় সে। পুরোপুরি বেলাইনে চলে যায়। তার এই চলা অত্যন্ত দ্রুতগতি লাভ করে কিছু অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীর সহযোগিতায়। নিজেদের স্বার্থেই বেনি পেলেডকে তৈরি করে তারা। ক্রমে ক্রমে অস্ত্র বিশারদে পরিণত হয় সে। যে কোন ধরনের বোমা প্রস্তুত এবং স্নাইপিঙেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ল্ডে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে। ওই জগতের মুকুটহীন সম্রাট এখন বেনি পেলেড।

আমেরিকান চরম বর্ণবিদ্বেষী কু ক্লুক্স ক্ল্যান, ব্রিটিশ চরম ডানপন্থী ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট, আইরিশ আই আর এ, ইটালিয়ান রেড ব্রিগেড, জার্মান বাদের মেইনহফ, জাপানী রেড আর্মি, এমনকি মাফিয়া পর্যন্ত ঠেকায়-বেঠেকায় শরণ নেয় তার। শোনা কথা, পেলেডের তৈরি প্ল্যান অনুযায়ী-ই কোজো ওকামোতোর নেতৃত্বে রেড আর্মি ১৯৭২-এর মে মাসে টোকিও এয়ারপোর্ট ম্যাসাকার পরিচালনা করেছিল।

মানুষটি কখন কোথায় অবস্থান করে, সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয় বেনি পেলেড। আজ দক্ষিণ-পুব এশিয়া তো কাল ইউরোপ। পরশু দক্ষিণ আমেরিকা, পরদিনই হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে। ফ্রি ল্যান্স সন্ত্রাসী সে। উপযুক্ত অর্থ পেলে যে কারও কাজ করতে প্রস্তুত। দেশে দেশে প্রচুর বন্ধু রয়েছে পেলেডের। এদের সাহায্যে 'চেইন অভ সোর্স' তৈরি করেছে সে। পেলেডকে প্রয়োজন পড়লে প্রার্থীকে প্রথমে 'চেইনের' সন্ধান পেতে হবে। চেইন তার 'বিশ্বস্ততা' সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হলে তবেই পাওয়া যাবে পেলেডের সন্ধান। বলা বাহুল্য, চেইনের খোঁজ সবাই পায় না।

দীর্ঘ সন্ত্রাসী জীবনে দুবার পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল পেলেড। একবার পশ্চিম জার্মানীতে, অন্যবার ওয়াশিংটনে। কিন্তু দুবারই রহস্যজনক কারণে ছাড়া পেয়ে যায় সে।

খবর পেয়ে সংক্ষিপ্ততম সময়ের নোটিশে ইউনাকোর বিশেষ বিমানে কায়রো পৌঁছায় রানা সদলবলে এবং ঝটিকা আক্রমণ চালায় নিউ জাহিদের গোপন ঘাঁটিতে। এই অভাবিত হামলায় প্রথমে খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়লেও অল্পক্ষণের মধ্যেই বেনি পেলেডের নেতৃত্বে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে নিউ জাহিদ। নিজেকে রক্ষা করার এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না পেলেডের। কারণ সে তখন স্ট্রাইক ফোর্সের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে, সরে যাওয়ার উপায় ছিল না।

কিন্তু এক সময় স্ট্রাইক ফোর্সের কৌশলের কাছে হার মানতে বাধ্য হয় ওরা। সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় নিউ জাহিদের গোপন ঘাঁটি। লড়াইয়ে তেইশজন সন্ত্রাসী নিহত হয়। এদিকে ছয়জন কম্যাণ্ডো নিহত এবং মাসুদ রানাসহ তেরোজন আহত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সেবার বেনি পেলেড।

এর সপ্তাহখানেক পর জানা গেল আলজেরিয়ায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে বেনি পেলেড। প্রথমে সিআইএ এবং পরে মোসাদ সে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছিল। অথচ...সুইংডোরের মৃদু 'ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ' শব্দে বাস্তবে ফিরল মাসুদ রানা।

ভেতরে ঢুকল বারাক। সালিম আল বারাক। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ একহারা যুবক। লেবানীজ। বয়স পঁচিশ। বৈরুতে রানা এজেন্সির শাখা প্রধান। আকাশী নীল টি-শার্ট এবং দুধের সর রঙের ঢলঢলে ট্রাউজার পরেছে বারাক। পায়ে স্পোর্টস কেডস্। দৃঢ় পায়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখ ইশারায় তাকে রানার অবস্থান দেখিয়ে দিল আহমেদ

ফৈয়াজ। ঘুরে দাঁড়াল যুবক, পা বাড়াল।

ইশারায় বারাককে বসতে বলল মাসুদ রানা। 'এনি ড্রিঙ্কস্?'

'থ্যাঙ্কস। একটা ডায়েটকোলা।'

গ্লাসের তলানি গলায় ঢালল রানা। ওয়েটার ডেকে একটা ডায়েটকোলা আনার নির্দেশ দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসল। 'নতুন কিছু জানা গেল?'

'না, মাসুদ ভাই। আজ সারাটাদিন সম্ভাব্য সব জায়গাতেই খোঁজ খবর করেছি। কেউ কিছু জানে না ওর ব্যাপারে। কথায় বার্তায় সবাইকে বরং ওর মৃত্যুর ব্যাপারেই নিশ্চিত মনে হলো। কিন্তু আমার চোখ ভুল দেখেনি। চেহারা অনেক পাল্টে ফেলেছে ব্যাটা, সেই লম্বা চুল দাড়ি কিছুই নেই, কামিয়ে ফেলেছে। তবে ও যে বেনি পেলেড, তাতে তিল পরিমাণ সন্দেহ নেই আমার। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

'না করলে এখানে দেখতে না তুমি আমাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বারাকের। পরক্ষণেই মলিন হয়ে গেল। 'আফসোস! ব্যাটাকে অনুসরণ করার সামান্যতম সুযোগও পেলাম না। মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। তবে চিন্তা নেই, মাসুদ ভাই। খোঁজ ওর পাওয়া যাবেই। আর একটি সূত্র আছে, যার কাছে পেলেডের সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। শহরে নেই সে, বাইরে কোথাও গেছে। রাত নটার দিকে ফিরবে।'

'কে সে?'

'ফারুক সোলেমান, এক ফ্রিল্যান্স ইনফর্মার। উপযুক্ত পয়সা পেলে সবার কাজ করে লোকটা।'

মাথা দোলাল রানা। 'চিনেছি। ঘুঘু লোক।' একটু ভাবল ও। 'পেলেডকে ধরতেই হবে যে করে হোক,' যেন নিজেকে শোনাল রানা। 'ছয়জন কম্যাণ্ডো হারিয়েছি আমি ওর হাতে। ওদিকে শুনছি, আবার নাকি

নিউ জাহিদ তৎপর হয়ে উঠেছে। কাজেই আর কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। নতুন কিছু ঘটার আগেই ওকে আমার চাই।'

ঘড়ি দেখল বারাক। সোয়া আটটা। 'চলুন তাহলে, ওঠা যাক। ফারুক পৌঁছার আগেই জায়গামত থানা গাড়ি গিয়ে।'

একটানা বিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে পশ্চিম বৈরুত পৌঁছল ওরা। মার এলিয়াস ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা ছোট বাংলোর অদূরে গাড়ি দাঁড় করাল বারাক। এদিকটায় রাস্তার বাতি নেই বলতে গেলে। কোনরকমে দেখা যায়। বাংলোটা দেখাল বারাক রানাকে। 'ওটায় থাকে ফারুক।' স্টার্ট বন্ধ করে দিল।

ভেতরে কোন বাতি জ্বলছে না। মানুষ চলাচল বেশ কম এদিকে। নীরব। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। সিগারেট ধরাল ওরা। হঠাৎ কাছেই কোথাও বিকট শব্দে মর্টার বিস্ফোরিত হলো। স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদে ঝট্ করে মাথা নিচু করল দুজনেই। কিন্তু এদিকে এল না গোলাটা, দূরে গিয়ে পড়েছে। ঠিক হয়ে বসার আগেই ফাটল আরেকটা। রানাকে মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক 'চুক্' আওয়াজ করতে শুনে মৃদু হাসল বারাক। 'সারা বছর এর মধ্যেই থাকি আমরা। গা সওয়া হয়ে গেছে।'

একজোড়া হেডলাইটের আলো চোখে পড়তে সিগারেট ফেলে নড়েচড়ে বসল রানা। এদিকেই আসছে গাড়িটা। 'এল বোধহয়,' বলল বারাক।

ওর ধারণাই ঠিক হলো। ওদের পাশ কাটিয়ে অন্ধকার বাংলোটার সামনে পৌঁছে থেমে পড়ল ছোট একটা গাড়ি। পাশ কাটাবার সময় লক্ষ করেছে রানা, সবুজ একটা পিগট। একজন নয়, দুজন আছে ভেতরে। ওটা থেমে পড়তে নিজেরটা স্টার্ট দিল বারাক, আলো না জ্বেলে ধীরগতিতে পিগটের পাঁচ গজের মধ্যে পৌঁছে থামল।

পিগটের দুই আরোহী নেমে পড়েছে। এদিকে পিছন ফিরে আছে বলে দেখতে পায়নি ওদের। বেশ অনেকদিন পর ফারুক সোলেমানকে দেখল মাসুদ রানা। অতীতে পয়সার বিনিময়ে বহুবার সার্ভিস কিনেছে রানা এ লোকের কাছ থেকে। নিজেদের পর্যাপ্ত সোর্স থাকার পরও সব দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ধরনা দেয় এর কাছে। সরকারের উঁচু-নিচু সব মহলেই সোলেমানের অবাধ আনাগোণা। তেমনি আণ্ডারগ্রাউণ্ড মহলেও। কি করে লোকটা এতদিক সামাল দেয়, সত্যিই রহস্যের ব্যাপার।

পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে হবে বয়স। খাটো। কুমড়োর মত গড়ন। চর্বি থলথলে। সোলেমানের সঙ্গীর দিকে নজর দিল রানা। বয়স্কা এক দেহপসারিণী। অন্তত তার সস্তা উৎকট মেক আপ্ দেখে সেরকমই মনে হয়। নিঃশব্দে, দ্রুত গাড়ি ত্যাগ করল রানা ও বারাক।

'নগদ পয়সা দিয়েই যখন আনা, তো বুড়ি কেন, ফারুক?' মোলায়েম কণ্ঠে বলল সালিম আল বারাক।

'অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কুমড়ো। কণ্ঠধারীকে চিনতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল তার। 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন প্রায়,' রুদ্ধশ্বাসে বলল ফারুক। সেই সঙ্গে ডান হাতের তালু দিয়ে সশব্দে চাপড় বসাল নিজের বাঁ বুকে, যেন্ কি পরিমাণ ভয় পেয়েছে তা বোঝাতে ওটা অপরিহার্য ছিল। 'এখানে কি করছেন আপনি, মিস্টার বারাক...মানে আপনারা?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলছে ফারুক সোলেমান। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘন ঘন রানার দিকে তাকাচ্ছে। সম্ভবত চিনতে পারেনি এখনও।

'জরুরী কিছু আলাপ করতে এলাম।'

'আজ সম্ভব নয়,' খানিকটা ঝাঁঝ প্রকাশ পেল ফারুকের কণ্ঠে। 'কাল আসুন। আজ আমি ব্যস্ত।'

রেগে গেল বারাক। 'ব্যস্ত ছিলে। এখন আর নেই। ভাগাও ওটাকে!'

'কিন্তু ওকে যে টাকা...'

'টাকা নিয়ে ভাবতে হবে না,' ফারুকের সামনে এসে দাঁড়াল বারাক। রানা জায়গা ছেড়ে নড়েনি। দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে। 'পুষিয়ে দেয়া হবে। আগে বিদেয় করো।'

ইংরেজি না জানার কারণে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে মহিলা। হিব্রুতে কড়া গলায় ফারুককে ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু জিজ্ঞেস করল সে। নিচু কণ্ঠে তাকে কিছু একটা বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল ফারুক। কিন্তু কাজ হলো না। বক্ বক্ থামছে না।

বারাকের দিকে ফিরে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল ফারুক। 'আরও টাকা চায়। টাউনে ফিরে যাওয়ার ট্যাক্সি ভাড়া।'

'দিয়ে দাও।' দাঁতে দাঁত চাপল বারাক।

'আমি!'

ডান হাত মুঠো পাকিয়ে আরেক পা এগোল বারাক। 'পুষিয়ে দেয়া হবে বলেছি, কানে যায়নি?'

গজ গজ করতে করতে এক তাড়া নোট বের করল ফারুক। ওর থেকে অবহেলা ভরে কয়েকটা আলাদা করে এগিয়ে দিল মেয়েলোকটির দিকে। থাবা দিয়ে নোটগুলো নিল সে। তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। ট্যাক্সির খোঁজে চলেছে। এবার ফারুকের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'আরে! মিস্টার রানা, আপনি?' তাড়াটা দ্রুত পকেটে চালান করে দিয়ে হাত কচলাতে লাগল ফারুক।

'ভেতরে চলো,' ইশারায় বাংলো নির্দেশ করল রানা।

পালা করে দুজনের দিকে তাকাল ফারুক। তারপর যেন বাধ্য হয়েই ঘুরে দাঁড়াল। একটা সরু সুরকির রাস্তা ধরে বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠল।

রানা ও বারাক অনুসরণ করল লোকটিকে। রঙবিহীন একটা দরজার সামনে দাঁড়াল ফারুক। তালা খুলে দরজা মেলে ধরল। পিছন ফিরে হাত ইশারায় ভেতরে যেতে বলল সে ওদের। নিজে ঢুকল সবার শেষে। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল।

'ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক, মিস্টার রানা। আমি কখনও বাসায় বসে ব্যবসায়িক আলাপ করি না।' বারাকের দিকে ফিরল ফারুক। 'আপনারা জানেন ব্যাপারটা। তবু কেন এলেন। কেউ যদি দেখে থাকে...'

'কেউ দেখেনি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল মাসুদ রানা।

স্থান বদল করল ফারুকের দৃষ্টি। ওর দিকে চেয়ে থাকল অপলক। মনে হলো, রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে। 'বলুন, আমার কাছে কি দরকার আপনাদের।'

'বেনি পেলেড।'

নামটা কানে যাওয়ামাত্র চোখের পাতা বারকয়েক পিটপিট করল ফারুক। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে ডান তর্জনি দিয়ে থুতনি চুলকাতে লাগল। একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। 'বেনি পেলেড! বুঝলাম না!'

'না বোঝার মত কিছু বলা হয়নি, ফারুক। বেনি পেলেডের সন্ধান চাই আমরা।'

'সে তো কবেই মরেছে।'

'বাজে কথা!' দাবড়ি লাগাল সালিম আল বারাক। 'কাল সকালে নিজে দেখেছি আমি ওকে।'

বিস্মিত হলো ফারুক। 'আপনি দেখেছেন! কোথায়?'

'আমেরিকান ইউনিভার্সিটি হসপিটালের সামনে। আগের সেই চেহারা অবশ্য নেই। তবে ও যে বেনি পেলেড, তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'অসম্ভব!' এপাশ ওপাশ মাথা দোলাল ফারুক জোরের সঙ্গে। 'অসম্ভব!

এ হতেই পারে না। নিশ্চই কোথাও কোন ভুল হয়েছে আপনার। বেনি পেলেড সত্যিই মারা গেছে।'

ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ভরে পা ফাঁক করে দাঁড়াল মাসুদ রানা। রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল বারাক, ইশারায় তাকে বারণ করল। 'এ ক্ষেত্রে আমি বারাকের পক্ষেই ভোট দিচ্ছি, ফারুক,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

তেমনি মাথা নাড়তে নাড়তে চোখের পাতা ডলল ফারুক সোলেমান। 'মিস্টার রানা, বেনি পেলেডের বেঁচে থাকার প্রশ্নই অবান্তর। আপনার কি মনে হয় না ও বেঁচে থাকলে ব্যাপারটা আমার তথ্য ব্যাঙ্কে,' নিজের মাথায় দুটো টোকা দিল ফারুক, 'থাকার কথা? বিশেষ করে যদি বৈরুতেই থেকে থাকে সে?'

'আমি বলিনি বৈরুতেই থাকে বেনি পেলেড। বলেছি, এখানে দেখেছি। হতে পারে কোন কাজে এসেছে,' বলল বারাক।

পকেট থেকে একটা পেটমোটা খাম বের করে ফারুকের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এটা রাখো। দশ হাজার ডলার, ক্যাশ। বেনি পেলেডের খোঁজ দাও, আরও দশ হাজার পাবে।'

মুহূর্তে চেহারা পাল্টে গেল লোকটার। চোখের তারায় লোভ ঝিকিয়ে উঠল। খাম খুলে নোটগুলো বের করল সে। অজান্তেই সামান্য ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট। সংবিৎ ফিরতে জিভের ডগায় দু'আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে নোট গুণতে শুরু করল ফারুক। সন্তুষ্টি ফুটল চেহারায়। 'কেন খুঁজছেন লোকটাকে, মিস্টার রানা?'

'জানার প্রয়োজন আছে তোমার?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'জানি জানি,' সবজান্তার মত হাসল ফারুক সোলেমান। 'আমি জানি কেন পেলেডকে খুঁজছেন আপনি। সে যাক, লোকটার কোন খবর যদি পাই, কোথায় জানাব? কোথায় পাব আপনাকে?'

'আমার ওখানে ফোন কোরো,' বলল বারাক। 'দিনে-রাতে যখন হোক, ফোনের পাশেই থাকব আমি।'

'বেশ,' খামটা পকেটে ঢোকাল ফারুক।

বেরিয়ে গেল রানা আর বারাক। কয়েক সেকেণ্ড পর ওদের গাড়ি স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ উঠল। ধুলোবালি কাঁকর ছড়িয়ে দ্রুত বাঁক নিল, তারপর সগর্জনে শহরমুখো ছুটল তুমুল গতিতে। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ফারুক জায়গায়। চোখের সামনে ভাসছে তার বাণ্ডিল বাণ্ডিল ডলার।

একসময় সচেতন হলো সে। আলো নিভিয়ে দরজায় তালা মেরে গাড়িতে এসে উঠল। স্টার্ট দিয়ে সোজা ছুটল উত্তরে। বিশ মিনিট চলার পর শহরের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছল ফারুক সোলেমান। দূর থেকে বাড়িটা চোখে পড়তে গতি কমাল। সাদা রঙের স্প্যানিশ স্টাইলের বিশাল এক ম্যানসন। দাঁড়িয়ে রয়েছে সাগরের দিকে মুখ করে।

ওটার বন্ধ লোহার গেটের সামনে পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করাল ফারুক। বাইরের গার্ড পোস্ট থেকে প্রকাণ্ডদেহী দাড়িওয়ালা এক গার্ড বেরিয়ে এল গাড়ি দেখে। লোকটির কাঁধে ঝুলছে কালাশনিকভ এ কে ফর্টি সেভেন। 'কি চাই?' কর্কশ গলায় প্রশ্ন করল সে।

'মিস্টার উইলসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

চোখ কুঁচকে গেল গার্ডের। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না। কিন্তু দেখা হওয়াটা খুবই জরুরী।'

'হবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করেন না মিস্টার উইলসন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কাল আসুন।'

'তাঁকে বলো ফারুক সোলেমান...'

'পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমি জানি আপনি কে। সকালে

আসুন। হয়তো বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব তখন।'

খেঁকিয়ে উঠল ফারুক। 'এখনই দেখা করব আমি!' দরজা খুলে নামার উদ্যোগ নিল।·

থাবা দিয়ে রাইফেলটা নামাল গার্ড। 'একবারই বলেছি অ্যাপয়েনমেন্ট ছাড়া দেখা হবে না,' হুমকি দিল সে।

রাগে চোখ লাল করে লোকটার দিকে চেয়ে থাকল ফারুক সোলেমান। দম ফেলছে ঝড়ের বেগে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'বেশ। যাচ্ছি। কিন্তু আমি এসেছিলাম গুরুত্বপূর্ণ একটা সংবাদ পৌঁছাতে। বড় রকম বিপদ হতে যাচ্ছে মিস্টার উইলসনের, সেটা জানাতে। যদি সত্যিই কিছু ঘটে যায় তাঁর...।'

ফারুককে দড়াম করে দরজা লাগাতে দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল গার্ড। এক পা এগিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। 'কিসের বিপদ?'

'সেটা তাকেই জানাব, যখন দেখা করার সুযোগ হবে।'

'একটু দাঁড়ান, প্লীজ! আমি দেখছি।' গাড়ির কাছ থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। কোমরে ঝোলানো একটা টু-ওয়ে রেডিও বের করে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল ভেতরের কারও সঙ্গে। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়ল ফারুক। একসময় বাক্য বিনিময় শেষ হলো, জানালা দিয়ে আবার উঁকি দিল গার্ড। এবার বেশ বিনয়ের সুরে বলল, 'সোজা ভেতরে চলে যান, স্যার। কোর্ট ইয়ার্ডে কেউ একজন অপেক্ষা করবে আপনার জন্যে।'

মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে গেল পুরু স্টীলের বিদ্যুৎনিয়ন্ত্রিত গেট, দুই পাল্লা সরে গেল দু পাশে। কংক্রিটের মসৃণ রাস্তা দিয়ে দেড়শো গজ এগোল ফারুক। তারপর ডানে বাঁক নিতেই কোর্ট ইয়ার্ড। ওখানে অপেক্ষা করছে আরেক গার্ড। ফারুককে সার্চ করল লোকটা। তারপর চওড়া পাথরের দশ-

বারোটা ধাপ টপকে বিশাল এক হলরুমে নিয়ে এল তাকে পথ দেখিয়ে।

'অপেক্ষা করুন। এক্ষুণি আসবেন মিস্টার উইলসন,' বলে বেরিয়ে গেল গার্ড। হলরুমের চারদিকে তাকাতে লাগল ফারুক সোলেমান। রুমের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে মহামূল্যবান এক চেকস্লোভাকিয়ান ঝাড়বাতি। দেখেই বোঝা যায় বহু প্রাচীন। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায় কোন এককালে এর চার দেয়াল জুড়ে ছিল দামী দামী পেইন্টিঙ। ফ্লোর কাঠের। তারওপর পুরু রঙচটা ইরানী কার্পেট।

হলরুমের শেষ প্রান্তে কাঠের সিঁড়ি, দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেছে ওপরে। মূল্যবান আবলুশ কাঠের তৈরি ধাপগুলো যেমন পুরু তেমনি অস্বাভাবিক চওড়া। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা রেলিঙ। তবে সবকিছুতেই যেন অযত্ন অবহেলার ছাপ। পীড়া দেয় চোখকে।

'কোন এক কালে টার্কিশ এক যুবরাজ তৈরি করিয়েছিলেন বাড়িটি নিজের আমোদ-প্রমোদের জন্যে,' হিব্রুতে বলে উঠল কে একজন।

চোখ তুলল ফারুক সোলেমান। সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ পেটা শরীরের এক যুবক। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। গায়ের রঙ তামাটে। লম্বাটে মুখ। ক্রু-কাট্ চুল। চিকন ভুরুর নিচে সামান্য কটা চোখ দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সুন্দর করে ছাঁটা সরু গোঁফের নিচে খানিকটা বেঁকে আছে ঠোঁটজোড়া। হাসছে যুবক। ডান চোখের পাশ থেকে প্রায় থুতনি পর্যন্ত সরু একটা কাটা দাগ।

পাতলা কাপড়ের ঢোলা হাফপ্যান্ট পরে আছে সে কেবল, ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি। পায়ে চপ্পল। 'সে অবশ্য পুরানো কথা। লেবানন তখন ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে।' পায়ে পায়ে নেমে এল যুবক। হাসিটা এখনও মলিন হয়নি। 'প্রথম দর্শনে অনেকেই অবাক হয় বাড়িটি দেখে। কিন্তু আমি হইনি। আমার মনে হয়েছে এটি যেন বিগতযৌবনা এক

বারবণিতা। আকর্ষণহীন, জৌলুসহীন।'

'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে আমি দুঃখিত, মিস্টার উইলসন,' বলল ফারুক। 'কিন্তু বিশেষ একটা...'

এক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল যুবক। 'যতদূর মনে পড়ে তোমার এখানে আসা বারণ ছিল।'

'বাধ্য হয়েই আসতে হলো,' আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল ফারুক। 'না এসে উপায় ছিল না। ব্যাপারটা আপনার জানা অত্যন্ত জরুরী।'

চিকন ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠল উইলসনের। 'বেশ। জানাও।'

অস্থির ফারুক এক পা থেকে অন্য পায়ে দেহের ভর স্থানান্তর করল। 'আপনার ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে গেছে, মিস্টার বেনি পেলেড।'

আরও কুঁচকে উঠল পেলেডের ভুরু। হাফ প্যান্টের দুই পকেটে হাতভরে এক পা দু পা করে একটা খোলা জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে। বাইরে লনের ওপাশে দেখা যাচ্ছে এক সুইমিং পুল। মৃদু হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ উঠছে পানিতে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থাকল পেলেড। আনমনা। 'কেউ চিনে ফেলেছে আমাকে?' পিছন না ফিরেই প্রশ্ন করল সে।

'জ্বি।'

'কে সে?'

'এক লেবানীজ। সালিম আল বারাক।'

নামটা নিয়ে খানিক ভাবল বেনি পেলেড। মাথা দোলাল। 'চিনতে পারছি না। আগে কখনও শুনিনি এ নাম। কে লোকটা, সাংবাদিক?'

জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল ফারুক সোলেমান। 'রানা এজেন্সির বৈরুত ইন-চার্জ। সে অবশ্য কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে অন্যজন। মাসুদ রানা। আমাকে বিশ হাজার ডলার অফার দিয়েছে মাসুদ রানা আপনার খোঁজ তাকে জানাবার জন্যে। খুব সম্ভব কায়রোর ওই ব্যাপারে

খুঁজছে আপনাকে মাসুদ রানা।'

মন্তব্যটা অগ্রাহ্য করল বেনি পেলেড। মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা ভাবনা চলছে তার। 'কোথায় আছে মাসুদ রানা?'

'জানি না। জিজ্ঞেস করেছিলাম অবশ্য, কিন্তু উত্তর পাইনি। তবে আপনার ব্যাপারে কিছু জানা গেলে বারাকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে আমাকে।'

মনে মনে প্ল্যান করে ফেলেছে পেলেড এরই মধ্যে। 'ঠিক আছে। বারাককে জানাও আমার ব্যাপারে কিছু তথ্য তাকে জানাবার আছে তোমার। ওদের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো। এতদূর যখন কষ্ট করে এসেই পড়েছে মাসুদ রানা, ফেরাই কি করে। ওর খানিকটা সন্তুষ্টির ব্যবস্থা তো অন্তত করতে হয়। আর হ্যাঁ, তোমার এখানে আসার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো। এসে বরং ভালই করেছ।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার পেলেড। আয়োজনটা কিরকম হবে?'

'কাল সকাল আটটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে মাসুদ রানার সঙ্গে। বারাকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে মাত্র এক ঘন্টা আগে, সাতটায়। এতে ওরা নিশ্চিত হবে যে সারারাত আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছ তুমি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। কিন্তু মিস্টার পেলেড, আমার...'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে এক হাত তুলল যুবক। 'বলতে হবে না।' বলে লাভ নেই, ভাবল সে, অন্তত এ যাত্রা শিকে ছিঁড়বে না তোমার ভাগ্যে। 'কাল টাকা নিয়ে লোক যাবে তোমার ওখানে। আর কিছু?'

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনাকে খবরটা দিতে এসে কতবড় ঝুঁকি আমি নিয়েছি।'

'পেরেছি কি পারিনি, সে কাল জানতে পারবে।'

'বেশ। এবার বলুন কিভাবে কি করব।'

একনাগাড়ে নিচু কণ্ঠে বলে চলল পেলেড। কথার মাঝে দু'তিনবার মাথা ঝাঁকাল ফারুক। মুখের ভাব দেখে মনে হলো যুবকের প্ল্যান শুনে চমৎকৃত হয়েছে। বক্তব্য শেষ করে বলল যুবক, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

দরজা পর্যন্ত এগোল বেনি পেলেড। হাফ প্যান্টের পকেটে হাত ভরে চেয়ে থাকল ফারুক সোলেমানের প্রায় গোল পিঠের দিকে। গাড়িতে উঠে বসল সে, রওনা হয়ে গেল গেটের উদ্দেশে। ঠোঁট গোল করে শিস দিতে লাগল পেলেড নিচু সুরে। মাসুদ রানার চোখে ও ধরা পড়ে গেছে, খবরটা মোটেই অবাক করেনি পেলেডকে। ও বরং এধরনের কিছুর অপেক্ষাতেই ছিল মনে মনে। জানত, একদিন না একদিন এমনটি ঘটবেই।

তবে রানার বৈরুত উপস্থিতির খবর আগেভাগে জানতে পেরে বেশ উপকার হয়েছে তার। এটা তার জন্যে একটা প্লাস পয়েন্ট। কাজে লাগাতে হবে পয়েন্টটা। সিঁড়ির দিকে চলল যুবক। নিউ ইয়র্কে একটা ফোন করতে হবে। খুবই জরুরী। সকালে ফারুকের মনের অবস্থা কেমন হবে ভেবে হাসি পেল তার।

সাইড টেবিলের লাল রঙের বিশেষ টেলিফোনটা বেজে উঠতে দ্রুত রিসিভার তুললেন পুলিস কমিশনার, বৈরুত (নর্থ), মাকেশ কাদুমি। 'হ্যালো!' ও প্রান্তের ব্যক্তিটি নিজের পরিচয় জানাল প্রথমে, সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গেলেন তিনি। দ্রুত কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। 'হ্যাঁ, বলুন। আমি নোট করছি।'

মন দিয়ে লোকটির বক্তব্য শুনলেন কমিশনার। মাঝেমধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে নিলেন। একসময় কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল তাঁর। খানিক

ইতস্তত করে বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লেবানীজ পুলিসের কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ ছাড়া...'

'এক ঘন্টার মধ্যে এনওয়াই পিডি-র অফিশিয়াল অনুরোধপত্র হাতে পেয়ে যাবেন আপনি। এ জন্যে ওটাই যথেষ্ট।'

'সে না হয় হলো,' ইতস্তত ভাবটা যাচ্ছে না কমিশনারের। 'কিন্তু...'

'আর হ্যাঁ। আপনার ব্যক্তিগত ইন্টারেস্টের ব্যাপারটিও দেখব আমি।'

'বুঝলাম না।' রিসিভার কানের কাছে শক্ত করে চেপে ধরে রাখলেন অফিসার, যেন একটি কথাও কান এড়িয়ে যেতে না পারে। 'কি সেটা?'

শব্দ করে হেসে উঠল ও প্রান্তের কণ্ঠটি। 'আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে কাল আপনার অ্যাকাউন্টে...থাক বরং। ওপেন লাইনে এসব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা না করাই ভাল, কি বলেন?'

ব্যস্ত হয়ে প্রায় উঠে দাঁড়ানোর আয়োজন করলেন কাদুমি। এবার সত্যি সত্যি আগ্রহ বোধ করছেন। অভিজ্ঞ অফিসার, এ ধরনের ডিলে রোজগার মন্দ হয় না, ভালই জানেন তিনি। 'ঠিক ঠিক! সে-ই ভাল। তাহলে কথা দিচ্ছেন...?'

'অবশ্যই। আর আমাদের কথা কখনও নড়চড় হয় না। দুনিয়া উল্টে গেলেও না।' 'আমাদের' শব্দটির ওপর খুব জোর দিল লোকটা।

'অলরাইট। ভাববেন না, এদিকে আমি দেখছি।'

'গুড! রেডি হয়ে যান তাহলে। অনুরোধ যাচ্ছে। গুড বাই।'

হঠাৎ করেই কেটে গেল লাইন। চিন্তিত মুখে কয়েক মুহূর্ত রিসিভারের দিকে চেয়ে থাকলেন কমিশনার, তারপর আলতো করে জায়গামত রেখে দিলেন ওটা। ঘড়ি দেখলেন, রাত সাড়ে এগারোটা। আগেভাগে তৈরি হয়ে নেয়াই ভাল। ইন্টারকমে সহকারীকে ডেকে পাঠালেন অফিসার।

*

রানার নির্দেশে সকাল সাতটায় নাস্তা নিয়ে এল রুম সার্ভিস। সেই সঙ্গে একটা বৈরুত ট্রিবিউন। পাঁউরুটিতে মাখন লাগিয়ে কামড় বসাল ও। অন্যমনস্ক। এখনও যোগাযোগ করছে না কেন ফারুক সোলেমান, ভাবছে। একহাতে চার ভাঁজ করা পত্রিকাটা মেলে দু হাঁটুর ওপর বিছিয়ে চোখ বোলাতে গেল। পরক্ষণে আহম্মক বনে গেল মাসুদ রানা। রুটি চিবানো বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি, ঝুলে পড়ল চোয়াল।

ডানদিকে তিন কলম ছয় ইঞ্চি জুড়ে ছাপা বেনি পেলেডের ছবি। ওপরে বড় হরফে লেখাঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বেনি পেলেড গ্রেফতার। হেডিঙের দিকে চেয়ে থাকল রানা অপলক। অক্ষরগুলো নাচছে চোখের সামনে। বেনি গ্রেফতার। তার মানে? ভাবছে মাসুদ রানা।

সরাসরি ক্যামেরার দিকে চেয়ে আছে যুবক। চিকন গোঁফের নিচে ঠোঁট বেঁকে আছে সামান্য—বিদ্রূপাত্মক সার্বক্ষণিক হাসি। সত্যিই চেনার উপায় নেই পেলেডকে। আগের সেই ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ঝাঁকড়া চুল আধ হাত ঝোলানো দাড়ি, সব ফেলে চেহারা আমূল বদলে ফেলেছে। ঠাহর করা কঠিন। তবে যতই চেষ্টা করুক, খুনীর চেহারা ঠিকই আছে ও-মুখে।

খবর পড়ায় মন দিল মাসুদ রানা। বলা হয়েছেঃ গত মধ্যরাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিস উত্তর বৈরুতে এক বাড়ি থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ইহুদী বেনি পেলেডকে গ্রেফতার করেছে। অভিযান চলাকালে পেলেডের সশস্ত্র রক্ষীরা পুলিস বাহিনীকে লক্ষ করে ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করলে আত্মরক্ষার্থে পুলিস পাল্টা গুলি চালায়। এতে দু'জন রক্ষী ঘটনাস্থলেই নিহত ও অপর পাঁচজন আহত হয়। পুলিস পক্ষে দুজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণে প্রকাশ, নিউ ইয়র্ক পুলিস ডিপার্টমেন্টের অনুরোধে এ অভিযান

চালানো হয়। এক অস্ত্রঘটিত অপরাধে জড়িত সন্দেহে এনওয়াইপিডি বেনি পেলেডের নামে পূর্বেই গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছিল। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রাথমিক প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করেছে তারা। দুই একদিনের মধ্যে পেলেডকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

খবর পড়া শেষ হতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মাসুদ রানা। চোখ বুজে আনমনে কপাল চুলকাতে লাগল। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কেমন প্রহসন প্রহসন গন্ধ পাচ্ছে ও। সূক্ষ্ম কোন একটা রহস্য রয়েছে যেন এরমধ্যে। যেন অদৃশ্য কোন হাত শেষ মুহূর্তে বাজ পাখির মত শিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওর কাছ থেকে। কিন্তু কেন এমন মনে হচ্ছে, অনেক ভেবেও তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না মাসুদ রানা।

দুই

হঠাৎ করে তেতে উঠেছে নিউ ইয়র্ক। সত্তর থেকে এক লাফে একশো ত্রিশে উঠে গেছে তাপমাত্রা, মাত্র চল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধানে। বাতাস নেই একেবারেই। মাথার ওপর নির্দয় সূর্যের গনগনে উত্তাপ। গরমে জনজীবন অতিষ্ঠ।

ইস্ট রিভার তীরে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ জাতিসংঘ ভবন। পায়ের কাছে অসংখ্য ফ্ল্যাগ পোস্টে সংঘের প্রতিটি সদস্য দেশের পতাকা উড়ছে। ভবনের বাইশ তলায় নিজের বিলাসবহুল অফিসে বসে আছেন ইউনাকো

চীফ কর্নেল মাইকেল ফিশার। বাইরের উত্তাপ এখান থেকেও কিছুটা অনুভব করতে পারছেন তিনি। টিনটেড কাঁচের দেয়ালের এপাশে পুরু ড্রেপার গরম হয়ে উঠেছে। এয়ারকণ্ডিশনারের সীমিত ক্ষমতা পেরে উঠছে না যেন তার সঙ্গে।

ঝাড়া ছয় ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ মাইকেল ফিশার। বয়স বাষট্টি। প্রশস্ত কপাল। সুন্দর ঢেউ খেলানো কোঁকড়া চুল। ইউ এস নেভি থেকে অবসর নেয়ার পর কিছুকাল জাতীয় সন্ত্রাস দমন বাহিনী ডেলটা ফোর্স প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ফিশার। সেখান থেকে এখানে। ইউনাকোর জন্মলগ্ন থেকেই পরিচালক।

হাতের বলপয়েন্ট কলমটা উল্টো করে ধরে টেবিলে ঠুকছেন তিনি অনেকক্ষণ থেকে। অন্যমনস্ক। বৈরুত পুলিসের হাতে বেনি পেলেডের ধরা পড়ার খবর পেয়েছেন তিনি। সংবাদটা অবাক করতে পারেনি তাঁকে। করেছে বেকুব, আহাম্মক। কারণ তিনি জানতেন আগেই মৃত্যু হয়েছে লোকটির প্রতিপক্ষের হাতে। জানতেন, মানে, সেরকমই জানানো হয়েছিল ইউনাকোকে।

সিআইএ এবং মোসাদ কনফার্মও করেছিল খবরটা। অথচ···। তাহলে কারা পেলেডের মৃত্যুর খবর ছড়িয়েছিল? কেন? ফিশার এবং তাঁর সহকারী লিওনিদ কলচিনস্কি বিশ্বাস করেছিলেন খবরটা। কোন সন্দেহ ছিল না মনে।

কিন্তু ইউনাকোর একজন তা বিশ্বাস করেনি। সে মাসুদ রানা। তা-ও অবশ্য দুদিন আগে পর্যন্ত জানতেন না ওঁরা। কারণ মাসুদ রানা তার অবিশ্বাসের ব্যাপারে জানায়নি কাউকে কিছু। মনে মনে চেপে রেখেছিল। এবং রানা এজেন্সির পৃথিবীব্যাপী প্রতিটি শাখায় বেনি পেলেডের সন্ধান বের করার যে নির্দেশ গিজেহ লড়াইয়ের পর পরই দিয়ে রেখেছিল, সেটাও

প্রত্যাহার করেনি ছেলেটা। বহাল রেখেছিল। ভেতরে ভেতরে খোঁজ চলছিল পেলেডের।

আশ্চর্য! মাসুদ রানার রেপুটেশন সম্পর্কে আগে অনেক কিছুই কানে এসেছে ফিশারের। এবার তার খানিকটা সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া গেল। ও কি নিশ্চিত জানত যে খবরটা মিথ্যে? সিআইএ মোসাদের কনফার্মেশনের ভেতর অন্য কিছু রয়েছে? কি হতে পারে তা? মাসুদ রানাকে ভুল পথে চালিত করা? কিন্তু কেন? এতে ওদের কি লাভ?

রানা যে ভেতরে ভেতরে পেলেডের অনুসন্ধান চালিয়ে আসছিল, তা মাত্র দুদিন আগে জানতে পারেন ফিশার এবং কলচিনস্কি। সেদিন বৈরুতের রানা এজেন্সি ফোনে রানাকে পেলেডের দেখা পাওয়ার খবর জানায়।

'বলো কি!' শুনে আঁতকে উঠেছিলেন দুই বৃদ্ধ। 'তাহলে ওর মৃত্যুর ব্যাপারে যে...!' আর কি বলবেন ভেবে না পেয়ে থেমে গিয়েছিলেন ফিশার।

'সাজানো নাটক,' উত্তর দিয়েছে মাসুদ রানা।

'তুমি বলতে চাও সিআইএ মোসাদ আমাদের ভুল কনফার্মেশন দিয়েছে ওর ব্যাপারে?' প্রশ্ন করলেন কলচিনস্কি।

সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছে মাসুদ রানা। 'ভেতরের কিছু কথা এখনও জানা বাকি আছে আমার, স্যার। তাই ওটা ভুল ছিল কি মিথ্যে ছিল, সে ব্যাপারে সরাসরি কোন মন্তব্য করতে চাই না এখনই। তবে উইথ অল রেসপেক্ট, স্যার, একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ওই দুই সংস্থা চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। অতীতে বহুবার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।'

অনেকক্ষণ গুম মেরে রইলেন ফিশার। 'বুঝলাম। কিন্তু এতে ওদের কি লাভ, আমার মাথায় খেলছে না।'

'আমিও জানি না, স্যার।'

'কোন ধারণা?' বললেন কলচিনস্কি।

মুচকি হেসে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'সেটাও প্রকাশ করা ঠিক হবে না, স্যার। অন্তত এখনই নয়। আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন কলচিনস্কি। মনে মনে বললেন, ছোঁড়া তো আচ্ছা ত্যাঁদোড়!

'এখন তাহলে কি করতে চাও তুমি, রানা?' জানতে চাইলেন ফিশার।

'নতুন কোন অ্যাকশনে নামার আগেই পেলেডকে ধরতে চাই। আমি নিশ্চিত লোকটা বসে নেই। ওর মত লোক বসে থাকে না, স্যার। ছয়জন কম্যাণ্ডো হারিয়েছি আমি। কাজেই, আর কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। বৈরুত যাচ্ছি আমি আজই।'

ইন্টারকম বেজে উঠতে কলম ঠোকা বন্ধ হয়ে গেল মাইকেল ফিশারের। চোখ ঘোরালেন তিনি। 'মাইকেল, তুমি ব্যস্ত?' উপ-প্রধান লিওনিদ কলচিনস্কির গলা শোনা গেল।

'নাহ্! চলে এসো।' পাশেরটা কলচিনস্কির রূম। একটা মিনিয়েচার ট্র্যান্সমিটারের সুইচ টিপলেন ফিশার। দুই রূমের মাঝখানের চকচকে স্টীলের দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন কলচিনস্কি। এগিয়ে এসে ফিশারের মুখোমুখি বসলেন।

ফিশারের থেকে বয়সে এক বছরের ছোট ভদ্রলোক। লম্বা পাঁচ ফুট নয়। শরীরের তুলনায় মুখটা বড়, প্রায় গোল। শুঁয়োপোকার মত মোটা, জোড়া ভুরুর নিচে বুদ্ধিদীপ্ত হালকা নীল চোখ। এক সময় কেজিবি-র অপারেশনস উইঙের (আমেরিকা) প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) লিওনিদ কলচিনস্কি। অবসর গ্রহণের পর জাতিসংঘ মহাসচিবের অনুরোধে এ পদে যোগ দেন।

'কি করছিলে?'

'ভাবছিলাম, মাসুদ রানার কথা। ওর ধারণাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। মিথ্যে কনফার্মেশন দিয়েছিল ওরা আমাদের।'

'সে তো পুরানো কথা,' বললেন কলচিনস্কি। 'লোকটা যে এবারও রানার হাত ফসকে গেল শেষ মুহূর্তে, সে ব্যাপারে...'

'হ্যাঁ। তা নিয়েও ভাবছি। আমার মনে হয়, লিওনিদ, এর মধ্যে গভীর কোন চক্রান্ত আছে। নইলে যেই মাসুদ রানা বৈরুত গেল, অমনি বেনি পেলেডকে গ্রেফতার করার অনুরোধ কেন জানাতে গেল এনওয়াইপিডি? এতদিন কি করছিল ওরা? এনওয়াই পিডি জানত, পেলেড বেঁচে আছে, সিআইএ জানত না? এ-ও কি বিশ্বাস করার মত কথা?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ফিশার।

'তাহলে, তুমি বলতে চাও,' থেমে থেমে বললেন উপ-প্রধান, 'পেলেডের সঙ্গে সিআইএ বা মোসাদের কোন যোগসূত্র রয়েছে?'

'নিশ্চিত না হয়ে কি করে বলি, বলো?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফিশার।

'হ্যাঁ...তা অবশ্য...। এনওয়াইপিডি-র ডেপুটি কমিশনার তো তোমার বন্ধু। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা যায় না কোন্ অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হলো বেনিকে?'

'করিনি ভেবেছো?'

'কি বলল সে?'

'পরে জানাবে বলেছে। জানার দরকার নেই। হারামজাদার উপযুক্ত সাজা হলেই হয়।'

'সাজা!' বিস্ফারিত চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকলেন লিওনিদ। 'এত অঘটনের পরও তুমি ভাবছ সাজা হবে পেলেডের। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তুমি এতক্ষণে?'

'মানে? কি বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি, কিছুই হবে না বেনি পেলেডের। কিচ্ছু হবে না। দেখে নিও তুমি।'

'এরকম কেন মনে হলো তোমার?'

'সোজা কথা, বন্ধু। লোকটা মারা যায়নি, অথচ রটানো হলো মরে গেছে। খবরটা কনফার্মও করা হলো। কেন? যাতে মাসুদ রানা ওকে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে। আবারও যদি তোমার প্রশ্ন হয়, কেন, তার উত্তর হবে, সিআইএ বা মোসাদ, কারও সঙ্গে যোগসূত্র আছে পেলেডের। ওদের কারও হয়ে কাজ করে সে। মাসুদ রানা তার নাগাল পাক, চায়নি ওরা। তাহলে হয়তো ওদের সঙ্গে তার জড়িত থাকার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাবে। বিপাকে পড়বে সিআইএ বা মোসাদ। ভেবে দেখো, সিআইএ কেন ব্যাপারটা আমাদের বিশ্বাস করাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল? আমরা কি ওদের কাছে কনফার্মেশন চেয়েছি? চাইনি। তাহলে? মোসাদ-ই বা কেন সায় দিতে গেল ওদের সঙ্গে?'

একদৃষ্টে কলচিনস্কির দিকে চেয়ে থাকলেন ফিশার। কপালে অসংখ্য চিন্তার ভাঁজ। এক সময় সংবিৎ ফিরল। আসন ছাড়লেন তিনি। টেবিলের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখা একটা ছড়ির দিকে হাত বাড়ালেন। ছড়ি ছাড়া চলতে পারেন না ফিশার। কোরিয়া যুদ্ধের শেষ দিকে ডান পা মারাত্মক জখম হয়েছিল। জখম সারলেও পা-টা আর ঠিক হয়নি। ছড়িতে ভর দিয়ে এক পা এক পা করে দেয়ালের দিকে এগোলেন কর্নেল।

এক হাতে ড্রেপার সরিয়ে বাইরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের উত্তাপ ঝাপটা মারল এসে নাকেমুখে। গাল কুঁচকে উঠল মাইকেল ফিশারের, তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। ছড়ি ধরা হাতের ওপর ডান নিতম্ব আলতো করে চাপিয়ে সামান্য কাত হয়ে দাঁড়ালেন এদিকে ফিরে।

'যা বললে, তা কি তুমি বিশ্বাস করো, লিওনিদ?'

'তুমি করো না?'

বন্ধুর পাল্টা প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলেন কর্নেল। মুখ নামিয়ে নিজের চকচকে পালিশ করা জুতোর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নাড়লেন আপনমনে। 'মনে হয় করি। মনে পড়েছে, বৈরুত যাওয়ার আগে রানাও যেন কথায় বার্তায় এ ধরনেরই একটা ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল। তখন অতটা ভেবে দেখিনি। এখন তোমার যুক্তিগুলো শুনে মনে হচ্ছে, হতে পারে।'

একটা সিগারেট ধরালেন লিওনিদ কলচিনস্কি। টান দিলেন লম্বা করে। 'খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, পেলেডের মৃত্যুর গুজবটিও ওরাই ছড়িয়েছিল।' মনে মনে বললেন, দ্য ব্লাডি সিআইএ। 'তবে এর সঙ্গে এনওয়াইপিডি কেন বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু...বেনি শুনেছি ফ্রি ল্যান্সার। তাহলে কেন ওরা লোকটার...।' প্রশ্নটা শেষ করলেন না ফিশার।

'হ্যাঁ। ওর ডোশিয়েতেও সেরকমই লেখা। কিন্তু ভেতরের খবর কি নিশ্চিতভাবে জানি আমরা কেউ? ওই ডোশিয়ে কাদের তৈরি জানা আছে তোমার?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন কর্নেল। অর্থাৎ, জানা নেই।

চারদিন পরের ঘটনা। নিউ ইয়র্ক রানা এজেন্সিতে নিজের অফিসরুমে পায়চারি করছে মাসুদ রানা। দু হাত পিছনে বাঁধা। দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি কিছু খুঁজছে। অনবরত ঘরের এমাথা ওমাথা করছে রানা। পদক্ষেপ অনিশ্চিত। মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়াচ্ছে জানালার পাশে। পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছে।

নিউ ইয়র্ক পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে গেছে বেনি পেলেড। বৈরুতে গ্রেফতার হওয়ার দুদিন পর, পরশু, এনওয়াইপিডি-র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল লোকটিকে। দেড়দিন এদের হেফাজতে ছিল পেলেড। আজ সকালে তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় দুজন পুলিসকে জখম করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সে।

যদিও ভেতরের খবর বলছে অন্য কথা। খোঁজ নিয়ে জেনেছে মাসুদ রানা, কোর্টে নেয়ার পথে ভ্যানের দরজা খুলে স্রেফ ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে আসলে। চারজন পুলিস ছিল ভ্যানে, প্রত্যেকেই তারা বহাল তবিয়তে আছে, কারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। এবং গা ঢাকা দিয়েছে বেনি পেলেড আবার।

খুব একটা অবাক হয়নি রানা এতে। বৈরুত থাকতেই ও অনুমান করেছিল যে রহস্যজনক একটা কিছু ঘটবে। বৈরুত ত্যাগের আগে পেলেডকে গ্রেফতার করার জন্যে এনওয়াইপিডি ওদের যে অনুরোধপত্র পাঠায়, তার একটা ফটোকপি জোগাড় করেছিল মাসুদ রানা।

ডেপুটি পুলিস কমিশনার নোভাক হ্যালি স্বাক্ষরিত পত্র ছিল ওটা। তবে পেলেডের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগের উল্লেখ ছিল না সেখানে। তখনই রানা আঁচ করে নিয়েছে কিছু ঘটতে চলেছে। পুলিসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওদের দিয়ে এ কাজ করানো হয়েছে, সম্ভবত। কে করিয়েছে কাজটা? বা কারা?

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্ত নিল, বেনি পেলেড সম্পর্কে ভাববে না ও এখন। হাতে একটা জরুরী কাজ আছে। পাঁচ দিন ব্যস্ত থাকতে হবে। তারপর এর একটা সুরাহা করবে সে।

তিন

'আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুই, লিওনিদ,' বললেন কর্নেল ফিশার। 'এ কোন্ জগতে আছি আমরা! পুলিসের এই হেঁয়ালির কি অর্থ হতে পারে!'

'সে তো আমারও প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর জানা নেই। মাইক, এ ধরনের ঘটনা আমার দেশে হরহামেশা ঘটে থাকে। অনেক নজির জানা আছে আমার। কিন্তু সে তো লৌহ যবনিকার অন্তরালের ঘটনা! তোমাদের সো কলড্ মুক্ত বিশ্বেও যে এই ভেলকিবাজি চলে,' কাঁধ ঝাঁকালেন ব্রিগেডিয়ার, 'তাও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকায়, ভাবতেও যেন কেমন লাগে।'

মুখ কালো হয়ে গেল ফিশারের। আঁতে ঘা লেগেছে। কিছু বলার জন্যে বারদুয়েক মুখ খুলেও বুজে ফেললেন ভাষা না পেয়ে। 'আমি দুঃখিত, মাইক,' বললেন কলচিনস্কি। 'তোমাকে বোধহয় কষ্ট দিলাম। বাট্, আই কুড নট হেলপ ইট।'

'না না, ঠিক আছে।'

'আমাদের আনুমানই ঠিক। এখন আর কোন সন্দেহই নেই যে কায়দা করে মাসুদ রানার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হলো বেনিকে। কে বা কারা ওকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে, সে ব্যাপারেও মোটামুটি অনুমান করতে পারি আমরা। আর...এনওয়াইপিডি-কে দোষ দিয়েও কোন লাভ নেই। ওরা কেবল ওপরের নির্দেশ পালন করেছে।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকলেন মাইকেল ফিশার। মনে মনে নাড়াচাড়া করছেন লিওনিদের মন্তব্য। 'রানা কোথায়?'

'নিজের রুমে আছে। জিম্বালার ফাইল পড়ছে।'

'যাক্। কাজটা তাহলে নিচ্ছে ও।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কলচিনস্কি, এমন সময় খড়মড় আওয়াজ উঠল ইন্টারকমে। 'মাসুদ রানা, স্যার। ভেতরে আসতে পারি?'

সিধে হলেন ফিশার। 'অফ কোর্স, রানা। কাম ইন।'

লিওনিদ কলচিনস্কির ওপাশের রুমে রানার অফিস। বেরিয়ে এল ও করিডরে। হাতে একটা ফাইল। ওপরে সাঁটা সাদা স্টিকারে টাইপ করা আছেঃ প্রেসিডেন্সিয়াল ট্যুর অভ রিপাবলিক অভ জিম্বালা। মাইকেল ফিশারের রুমের সামনে পৌঁছার আগেই খুলে গেল বিদ্যুৎনিয়ন্ত্রিত স্টীলের ফ্রন্ট ডোর।

'বোসো, রানা। এতক্ষণ বেনি পেলেডের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম আমরা। ব্যাপারটা দুঃখজনক। খুব ইয়ে...মানে, কি বলব...।'

মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। দুই বৃদ্ধের দিকে তাকাল ও। 'এ জন্যে আপনাদের দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই, স্যার। আমিও মোটেই দুঃখিত নই। কেবল একটা আনুরোধ আছে, আপনাদের দুজনের কাছে।'

'অবশ্যই,' নড়েচড়ে বসলেন কলচিনস্কি। 'বলো।'

'বেনি পেলেড কেন ছাড়া পেল, কিভাবে ছাড়া পেল, এ নিয়ে পিডিতে অথবা আর কোথাও কোনরকম খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করবেন না আপনারা কেউ। আই মীন, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না ইউনাকো। আপনারা কেউ কিছু জানেন না, জানার আগ্রহও নেই।' হাতের ফাইলে দুটো টোকা দিল ও। 'এটা সেরে ওর ব্যাপারে যা করার আমিই করব।'

'বেশতো!' কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন মাইকেল ফিশার। 'তাই

হবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন চীফ। 'রানা, কফি? লিওনিদ?'

দুজনেই হ্যাঁ সূচক মাথা দোলাল।

তিন কাপ কফির কথা বলে সিগারেট বের করলেন তিনি। প্যাকেট এগিয়ে দিলেন ওদের দিকে। 'রানা, জিম্বালা সম্পর্কে কতটুকু জানা আছে তোমার?'

ডেপুটি চীফকে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করল মাসুদ রানা। নিজেও ধরিয়ে নিল। 'বেশি কিছু না, স্যার। মধ্য আফ্রিকান ক্ষুদ্র একটি দেশ। প্রতিবেশী শাদ, নাইজার এবং সুদান। মূল্যবান খনিজ ও বন সম্পদ প্রচুর আছে। অবশ্য দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে দুটো সম্পদই, চোরা পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে। এক সময় ফরাসী উপনিবেশ ছিল জিম্বালা।'

মাথা দোলালেন কর্নেল। 'স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে কিছুদিন আগ পর্যন্ত আলফোনসো নগুয়েন ছিলেন জিম্বালার প্রেসিডেন্ট। যাকে বলে জগদ্দল পাথর। নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে গেছেন নগুয়েন বছরের পর বছর। বারোটা বেজে গেছে দেশের অর্থনীতির। গত মাসে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বড় ছেলে রামেল নগুয়েন বর্তমান প্রেসিডেন্ট।'

'রামেল আমার পরিচিত,' বলল রানা।

'তাই নাকি?' একটু যেন থমকালেন বৃদ্ধ।

'অনেকদিন আগে অক্সফোর্ডে পরিচয় হয়েছিল। ওখানেই পড়াশুনা করেছে রামেল নগুয়েন।'

'হ্যাঁ। ওর অটোবায়োগ্রাফিতে তাই দেখলাম,' ভুরু চুলকালেন ফিশার। 'সমস্যা হয়েছে, রানা, রামেল নগুয়েন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু আলফোনসো নগুয়েনের সময় রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া

একটি গোষ্ঠি সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে পিতার আমলের নিরাপত্তা পুলিসকে রামেল নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ওরাও ভীষণ খেপেছে। ওদের মধ্যে থেকে চারজনকে নিয়ে একটা দল গঠন করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার জন্যে। এর পিছনে অর্থ জোগাচ্ছে নব্য ধনীরা। ওরা হুমকি দিয়েছে নিউ ইয়র্কের মাটিতেই হত্যা করা হবে রামেলকে। বুঝতেই পারছ, এতে যদি ওরা সক্ষম হয় মারাত্মক বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্যাপারটাকে তাই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।'

'এবং সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ডটি প্রতিরোধ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তেছে ইউনাকোর ঘাড়ে,' বললেন লিওনিদ কলচিনস্কি। 'মানে, তোমার ঘাড়ে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ফিশার।

'খবরটা পাওয়া গেল কোন সূত্রে?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'এ ব্যাপারে ফাইলে তো কোন উল্লেখ নেই।'

'নেই। তোমাকে সরাসরি বলব বলে ওসব ইনক্লুড করিনি। সে যাক, সিআইএ গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে ব্যাপারটা এবং প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছে। এই নিয়ে কদিন আগে বেশ একচোট হয়েছে আমার ওদের ডেপুটি ডিরেকটরের সঙ্গে।' মৃদু হাসলেন ফিশার। 'তুমি তখন বৈরুত।'

'কেন?' ফের সিআইএ? ভাবল ও।

'যেহেতু সিআইএ নিজের সূত্রে প্রথম এ খবর জানতে পেরেছে এবং প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেছে, সেহেতু ওরা প্রায় নিশ্চিত ছিল যে রামেল নগুয়েনের নিউ ইয়র্ক সফরের সময়কার নিরাপত্তার দায়িত্ব ওদেরকেই দেয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি। প্রেসিডেন্টের জরুরী কল পেয়ে ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম আমি। সেখানে ওদের ডেপুটি ডিরেকটর মার্ক গর্ডনের উপস্থিতিতেই দায়িত্বটা আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়। প্রেসিডেন্টের এই

সিদ্ধান্তে বেশ অসন্তুষ্ট হয় গর্ডন। পরে প্রেসিডেন্টকে সে অনুরোধ জানায়, নিরাপত্তা রক্ষী নেয়া হোক ইউনাকো থেকে। এবং তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব সিআইএ-কে দেয়া হোক। আমি সোজা না করে দিয়েছি।

'কিন্তু লোকটা বড় নাছোড়বান্দা। তারপরও ঝোলাঝুলি করতে লাগল যেন তার দুজনকে অন্তত আমাদের দলের সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। এতে আর না করিনি। বলতে পারো, গর্ডনের প্যানপ্যানানির হাত থেকে বাঁচার জন্যেই রাজি হয়েছি। তাছাড়া, প্রেসিডেন্টের ভাব দেখে মনে হলো, তিনিও চাইছেন যেন প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখ্যান না করি। গর্ডন দাবি করেছে, তার ওই দুজন নাকি "বুলেট ক্যাচার"।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে কফিতে। ইউনাকো সিকিউরিটি টীমে নিজের দুজনকে ঢোকানোর কী এমন প্রয়োজন পড়ল গর্ডনের ভেবে পাচ্ছে না। ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না ওর।

'এদের দুজনের নাম জানা গেছে?'

'না, এখনও জানতে পারিনি। তবে আজ বিকেলের মধ্যে কনফার্ম করবে ল্যাঙলি।'

আরও মিনিট দশেক এটা-ওটা আলোচনার পর নিজের রুমে ফিরে এল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা, সতর্কতার মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে রামেল নগুয়েন নিউইয়র্কে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম কাজ তাঁর নিরাপত্তা, দ্বিতীয় সিআইএ-র দুই বুলেট ক্যাচারের গতিবিধি লক্ষ করা। কেন ঢোকানো হলো ওদের এর মধ্যে? ইউনাকোর কি এ কাজে যোগ্য লোকের অভাব আছে?

সিআইএ-র চিন্তা দূর করে দিল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে রামেল নগুয়েনের কথা ভাবতে লাগল। একনায়ক আলফোনসো নগুয়েনের আদরের বড় ছেলে। তার মুখেই শুনেছে রানা, দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্টের

উপযুক্ত করে তোলার জন্যে আলফোনসো ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন কেমব্রিজ। সেই প্রথম রামেলের দেশের বাইরে পা রাখা। ভেতরে ভেতরে বাপের স্বৈরাচার একেবারেই সহ্য করতে পারত না সে। নিরীহ সাধারণ দেশবাসীর ওপর পিতার নিরাপত্তা পুলিস বাহিনীর বর্বর অত্যাচার দেখে খুব কষ্ট পেত মনে। এ জন্যে প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। মনে মনে শপথ নিত, বড় হয়ে সে বসবে পিতার আসনে।

জিম্বালার নির্যাতিত জনগণ যা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি, সেই গণতন্ত্র উপহার দেবে রামেল তাদের। অবিচার অত্যাচারের অবসান ঘটবে দেশে। সারা পৃথিবী দেখবে, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে যার অস্তিত্বই নেই, ছিল না কোন কালে, সেই গণতন্ত্র সবার থেকে জিম্বালাকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে, করেছে মহিমান্বিত।

পিতার নির্দেশ পেয়ে দেশত্যাগ করে রামেল। কিন্তু স্বকীয়তা ত্যাগ করেনি। অক্সফোর্ডের শেষ দিনটি পর্যন্ত রামেল নগুয়েন ছিল একজন খাঁটি আফ্রিকান। দেশে যেমন, তেমনি ভার্সিটিতেও দেশী পোশাক পরে ক্লাস করত। রামেলের ছাত্রাবাসের রুম দেখলে মনে হত আফ্রিকান স্মৃতিচিহ্নের ছোটখাট সংগ্রহশালা। বিশাল কেমব্রিজে একটিও বন্ধু ছিল না তার। আফ্রিকান দু'চারজন ছাড়া কারও সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত ঘটেনি। রুম থেকে ক্লাস, ক্লাস থেকে রুম, এই ছিল রামেলের দৈনন্দিন রুটিন।

পড়াশুনার ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস ছিল রামেল নগুয়েন। জানত, ফলাফল আশানুরূপ না হলে পিতা রুষ্ট হবেন। পুরো পরিবারের জন্যে মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সে ব্যর্থ হলে। কারণ আফ্রিকায় ব্যর্থতাকে ঘৃণা করা হয় মনেপ্রাণে, ব্যর্থকে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে সবাই তাকে করুণা করে, এড়িয়ে চলে। তেমন কিছু হলে জিম্বালার প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না কোনদিন রামেল, তার স্বপ্নের গণতন্ত্র স্বপ্নই থেকে যাবে।

ভালই এগোচ্ছিল রামেল নগুয়েন, এমন সময়, ফাইন্যাল পরীক্ষার তিন-চার মাস আগে ঘটল এক দুর্ঘটনা। রামেলের পাশের রুমের ছাত্রটিকে এক সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল রুমে। নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাকে। পুলিস সন্দেহ করল 'রহস্যময় চরিত্র' রামেল নগুয়েনকে। গ্রেফতার করা হলো তাকে।

লণ্ডনেই ছিল তখন মাসুদ রানা। রামেল গ্রেফতার হওয়ার কদিন পর জিম্বালার রাষ্ট্রদূত বিনা নোটিশে এসে হাজির, দেখা করতে চান ওর সঙ্গে। সাক্ষাৎ দিল মাসুদ রানা, এবং হাজার আপত্তি সত্ত্বেও রামেল নগুয়েনকে নির্দোষ প্রমাণ করার দায়িত্ব কাঁধে নিতেই হলো। একটি দেশের প্রেসিডেন্টের ঐকান্তিক ব্যক্তিগত অনুরোধ রক্ষা না করে পারা গেল না, বিশেষ করে যখন জানা গেল ছেলেটিকে জিম্বালার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই অক্সফোর্ডে পাঠিয়েছিলেন আলফোনসো নগুয়েন।

কাজে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। অল্প কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় জানা গেল, নিহত ছাত্রটি ছিল ড্রাগ অ্যাডিক্ট। একই সঙ্গে ড্রাগ সাপ্লায়ারও। বড় পার্টির কাছ থেকে বাকিতে ড্রাগ নিয়ে সরবরাহ করত অন্য অ্যাডিক্ট ছাত্রদের মধ্যে। বাকি টাকা শোধ দেয়া নিয়ে গণ্ডগোলের জের হিসেবে হত্যা করা হয় ছেলেটিকে।

সচকিত হলো মাসুদ রানা। ঘড়ির ওপর চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখা প্রয়োজন। সবার আগে ম্যানেজ করতে হবে হারলেম। রামেল নগুয়েনের প্রোগ্রামের অন্য সব জায়গা থেকে ওটাই বেশি বিপজ্জনক।

চার

জিম্বালার রাজধানী হ্যাবেন। ঘড়িতে ন'টা বাজতে ত্রিশ মিনিট বাকি। প্রশস্ত প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে কালো একটি বুইক। রাস্তার আলোয় চক চক করছে ওটার পালিশ করা বডি। বুইকের আরোহী জামেল নগুয়েন, প্রেসিডেন্ট রামেল নগুয়েনের ছোট ভাই। ড্রাইভার নেয়নি সে আজ, কারণ অত্যন্ত গোপন এক মিশনে চলেছে সে এ মুহূর্তে। কাক-পক্ষীকেও জামেল কিচ্ছুটি টের পেতে দিতে চায় না এ ব্যাপারে।

রামেলের ছয় বছরের ছোট জামেল। বড় ভাই দেশের প্রেসিডেন্ট হলেও রাজনীতির সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। পেশায় জামেল সাংবাদিক। হ্যাবেনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফরাসী ভাষার পত্রিকা লা ভয়েক্স-এর সম্পাদক। পিতার নয়, বরং বড় ভাইয়ের স্নেহের ছায়ায়, শাসনের বেড়াজালে মানুষ হয়েছে সে। রামেল নগুয়েন তার আদর্শ পুরুষ।

তবে ভাইয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়াটা খুব একটা প্রসন্ন মনে নিতে পারেনি জামেল। মনেপ্রাণে সে একজন খাঁটি কমিউনিস্ট। রামেলের মত সে-ও লেখাপড়ার সমাপ্তি টেনেছে ইংল্যাণ্ডে। অক্সফোর্ডে। ছোটবেলা থেকেই জামেল ঘাড়ত্যাড়া পদের। যে আলফোনসোর ভয়ে জিম্বালা কাঁপত, সেই বাপকে থোড়াই কেয়ার করত জামেল।

এবং মনের ভাব রামেলের মত চেপে রাখতেও পারত না সে, প্রকাশ

করে দিত নির্ভয়ে। বাপের মুখে মুখে তর্ক জুড়ে দিত নিঃশঙ্কচিত্তে। আলফোনসো ভেবেছেন বয়সের দোষ, ঠিক হয়ে যাবে মাজাঘষা করলে। খুনের দায় থেকে সুবোধ বড় ছেলের অব্যাহতির সংবাদ পাওয়ামাত্র ত্যাড়াটিকে অক্সফোর্ড পাঠানোর আয়োজন পাকা করে ফেললেন তিনি।

কিন্তু ফল হলো উল্টো। ইংল্যাণ্ড পৌঁছে বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যেই সেদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে বসল জামেল ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। কমিউনিজমের নাম শুনলেও বিবমিষা হত আলফোনসো নগুয়েনের। জামেলকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন তিনি, সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন কাঁধের কমিউনিজমের ভূত না নামা পর্যন্ত দেশে ফিরতে পারবে না সে।

টাকার যোগান বন্ধ হয়ে যেতে অক্সফোর্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হলো জামেল নগুয়েন। খুঁজেপেতে নিজের খরচ চালাবার মত একটা চাকরি জোগাড় করে নিল গার্ডিয়ান পত্রিকায়। দুই বছর গার্ডিয়ানে চাকরি করে জামেল, সেখান থেকে যোগ দেয় এক বামপন্থী ফরাসী পত্রিকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে। তখন থেকেই শুরু হয় তার কলমে আফ্রিকার একনায়কদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। বিশেষ করে পিতার কড়া সমালোচনা শুরু করে দেয় জামেল। ছেলের আচরণে ভীষণ বিরক্ত হন আলফোনসো নগুয়েন। ঘোষণা করে দেন, তাঁর জীবিতাবস্থায় জিম্বালায় ফিরতে পারবে না জামেল নগুয়েন। তারও আসার ইচ্ছে হয়নি কোনদিন।

পিতার শেষকৃত্যে যোগ দিতে মাত্র এক মাস আগে দেশে ফিরেছে জামেল বড় ভাইয়ের নির্দেশে, আট বছর পর। এই সুবাদে ধরে বসল তাকে লা ভয়েক্স পত্রিকার পরিচালনা কর্তৃপক্ষ। এমনিতে দেশে থাকার ইচ্ছে ছিল না তার একেবারেই, কিন্তু এদের পীড়াপীড়ি আর বড় ভাই এবং মায়ের অনরোধে সিদ্ধান্ত বদলাল জামেল। লা ভয়েক্স-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ

করে থেকে গেল দেশে।

মাস পুরো হয়নি এখনও, এরই মধ্যে একটা মেজর স্কুপ হাতে পড়েছে জামেল নগুয়েনের। রামেল নগুয়েনকে ক্ষমতাচ্যুত করে আরেক একনায়কতন্ত্রের জগদ্দল পাথর জিম্বালার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার নীল নকশা। শুধু এই-ই নয়, আরও আছে। এই নীল-নকশার পিছনে একটি বড় দেশের গোয়েন্দা সংস্থাও যে জড়িত সে প্রমাণও হাতে পড়েছে জামেলের। কিন্তু সংবাদটা ছাপানো বা বড় ভাইয়ের কানে তোলার আগে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন। সেগুলো সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে জামেল নগুয়েন। তার ইনফর্মার অপেক্ষা করছে।

আজ মাঝরাতের পর নির্ধারিত নিউ ইয়র্ক সফরে রওয়ানা হচ্ছে রামেল নগুয়েন। সে যাত্রা করার আগেই যদি সমস্ত প্রমাণ...। ইনফর্মারের নির্দেশ মত পরিচিত একটি দশতলা ভবনের বেসমেন্ট কার পার্কে ঢুকে পড়ল জামেল। এক কোণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল। হাতঘড়িতে চোখ বোলাল। আটটা সাতান্ন। ডানে বাঁয়ে তাকাল জামেল। ছাড়া ছাড়া অল্প কয়েকটা গাড়ি আছে এখনও পার্কে। দু মাথায় দুটো বাতি জ্বলছে ভেতরে, আলো পর্যাপ্ত নয়।

আর তিন মিনিট পর পৌঁছুবে ইনফর্মার, ঠিক ন'টায়। নেমে পড়ল জামেল গাড়ি থেকে। দরজা বন্ধ করে বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে নিল একটা। আরেকবার নিজের চারদিকে তাকাল সে। কোথাও কোন আওয়াজ নেই, কবরের নিস্তব্ধতা। অস্বস্তি লেগে উঠল তার হঠাৎ করেই। সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিল জামেল। দুশ্চিন্তা গ্রাস করতে শুরু করেছে তাকে একটু একটু করে।

চটে উঠল জামেল নিজের ওপর। শুধু শুধু ভাবছে সে। আরেকবার কষে চুমুক দিল সিগারেটে। এবং সেই মুহূর্তেই গাড়িটার ওপর চোখ পড়ল।

পার্কের অন্য প্রান্তে দুটো গাড়ির ওপাশে দাঁড়িয়ে লাল একটা স্টুডিবেকার। এতক্ষণ দেখতেই পায়নি। গাড়িটা জামেলের ইনফর্মারের, যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে। বনেটে কনুইয়ের গুঁতো মেরে সিধে হলো সে, মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে।

সিগারেট পায়ের তলায় পিষে গাড়িটার দিকে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগোলো জামেল নগুয়েন। এবার হুইলের পিছনে বসা লোকটিকেও দেখতে পেল। বসে আছে কেন লোকটা গাড়িতে? ভাবল সে, ওকে আসতে দেখেনি নাকি? কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিল জামেল। 'কি ব্যাপার! তুমি...' ভীষণভাবে আঁতকে উঠল সে, স্বর আটকে গেল গলায়।

হেলান দিয়ে বসে আছে ইনফর্মার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জবাই করা হয়েছে লোকটিকে। নিখুঁত হাতের কাজ। এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হাঁ হয়ে আছে গলা। ভিজে বুক-পেটের সঙ্গে লেপ্টে আছে শার্ট। কে যেন ধাক্কা মেরে জানালার কাছ থেকে দু'পা সরিয়ে আনল জামেল নগুয়েনকে। ঢোঁক গেলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হলো না। তীব্র আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে গলা মুহূর্তে। কাঠ হয়ে আছে।

এই সময় গাড়িটার পিছন দিকে খশ্ খশ্ আওয়াজ উঠল। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকাল জামেল। মুখোশ আঁটা দুটো ছায়ামূর্তি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটোই কালো ওভারল পরা। জোর করে নিজেকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করল জামেল নগুয়েন, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু ঠিক পিছনে 'খুট্' করে আরেকটা আওয়াজ উঠতে থেমে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল সে।

পরক্ষণেই শক্ত, ভারি একটা কিছু আছড়ে পড়ল জামেল নগুয়েনের কানের পিছনে।

দপ করে নিভে গেল আলো।

*

হ্যাবেন কেন্দ্র থেকে গাড়িপথের দশ মিনিট দূরত্বে খুদে জেলা, লা টামবিয়ের। এখানেই রয়েছে দেশের প্রধান কারাগার। জেলার নামানুসারে এটির নামও লা টামবিয়ের। আলফোনসো নগুয়েন ক্ষমতায় বসেই নির্মাণ করেন এই দুর্ভেদ্য কারাগার এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই দেশবাসী এর নামকরণ করে লা বুচেরি, বা কসাইখানা। সরকার বিরোধী শত শত জিম্বালান নিরাপত্তা পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছে এখানে।

পিতার আসনে বসার দিনই দুটো ডিক্রি জারি করেন রামেল নগুয়েন। প্রথমটি ছিল লা টামবিয়েরের সকল রাজনৈতিক বন্দীকে তাৎক্ষণিক মুক্তি প্রদান, এবং অন্যটি নিরাপত্তা পুলিস বাহিনী নিষিদ্ধ করা সম্পর্কিত। দিন বদলে গেছে। তাই আলফোনসো নগুয়েনের বিশ্বস্ত সেবক তাঁর দীর্ঘ তেইশ বছরের ডান হাত, নিষিদ্ধ পুলিস প্রধান জা ভুলি, ওরফে লা বুচের, আজ লা টামবিয়েরে ঘানি টানছে।

জা ভুলি গ্রেফতার হওয়ার পর সারাদেশে অসংখ্য মীটিং মিছিল হয়েছে তার ফাঁসীর দাবিতে। কিন্তু সে দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট রামেল। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, জা ভুলির বিচার হবে। তাতে সে দোষী প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে তাকে। কিন্তু জিম্বালায় আর কোন ফাঁসী নয়। এদেশের ফাঁসী-গুলির বিচার ব্যবস্থা আলফোনসো নগুয়েনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

নিজের আট বাই ছয় মাপের সেলে লোহার কটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জা ভুলি। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ সে। বয়স আটান্ন। চৌকো মুখের নিচে, থুতনিতে কয়েকগাছা ছাগলা দাড়ি, প্রতিটির প্রান্ত বাঁক খেয়ে টাকরার নিচে সেঁটে আছে। যেন আঠা মাখিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানটায়। লোহার মত পেটা, দশাসই দেহের সর্বত্র অসংখ্য ক্ষতের স্মৃতি তার। জনগণের

শুভেচ্ছা চিহ্ন।

রামেল নগুয়েনের ডিক্রির কথা রেডিওতে ঘোষণা করামাত্র জনতা হামলা করে বসেছিল তার বিশাল বাগানঘেরা প্রাসাদোপম সরকারী বাসভবনে। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে, তাই দিয়ে মনের আনন্দে পিটিয়ে প্রাণটা তার জিভের ডগায় এনে ছেড়েছিল তারা প্রায়। এক সময় জা ভুলির কাতরানি, নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে দেখে তাদের মধ্যে অতি উৎসাহী কয়েকজন দড়ি জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিজের বাগানেই ফাঁসীতে লটকাবে লা বুচেরকে। কিন্তু ভাগ্য ভাল। সময়মত এক ট্রাক আর্মি পৌঁছে উদ্ধার করে রক্তাক্ত নিথর জা ভুলিকে। সেদিন থেকেই লা টামবিয়ের তার বাড়িঘর।

চোখমুখ বিকৃত করে উঠে বসল জা ভুলি। ভীষণ নোংরা ভেতরটা, দুর্গন্ধে বত্রিশ নাড়ি থেকে থেকে পাক খেয়ে উঠছে পেটের ভেতর। বিষণ্ন দৃষ্টিতে চারদিক তাকাল ভুলি। এই সেলে কত বন্দী তার নির্যাতন সইতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছে, আনমনে ভাবছে। লা টামবিয়ের এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কোনডেসির ব্রাঙ্কো এই দুই কারাগারের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল ভুলি এই সেদিন পর্যন্ত। আর আজ কি না...।

বাইরে থেকে ভারি জ্যাকহ্যামারের শব্দ ভেসে আসতে চোখ কোঁচকাল ভুলি। কিসের শব্দ ওটা? ঘড়ি নেই। কটা বাজে জানে না সে। তবে অনুমান রাত দেড়টা-দুটো হবে, কমপক্ষে। এই অসময়ে কারা কি করছে বাইরে? রাস্তা খুঁড়ছে? নাকি... সকালে যে গার্ডটি ওর নাশতা নিয়ে আসবে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ভাবল জা ভুলি।

বাইরের মেইন গেটে এ মুহূর্তে একজন মাত্র গার্ড রয়েছে পাহারায়। মাইকেল ম্যাসেগনা। ভেতরে আছে আরও পাঁচজন। বিশ্রাম নিচ্ছে তারা। কারাগারের সামনের রাস্তায় কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছে, একটা ফাটা

পাইপ লাইন মেরামত করছে তারা। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বুলডোজার। ওটা কেন এসেছে জানে না ম্যাসেগনা।

ডান হাতে ধরা এফএন এফএএল সেমি অটোমেটিক রাইফেলটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত মুঠো করে ঘন ঘন ঝাড়া দিতে লাগল ম্যাসেগনা। টনটন করছে হাতটা। চোখ পড়ে আছে তার লোকগুলোর ওপর। ওদের মধ্যে দুজনকে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখল ম্যাসেগনা। কথা বলতে বলতে এদিকেই হেঁটে আসছে লোক দুটো। দুজনেই কালো ওভারল পরা।

ম্যাসেগনা জানে না, ওদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা ব্যক্তিটি টমাস সিবেলে। জা ভুলির ডান হাত। রামেল নগুয়েন ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই পলাতক সে। ওই দিন কোন এক কাজে কোনডেসি যেতে হয়েছিল সিবেলেকে। সন্ধেয় হ্যাবেন ফেরার পথে রামেলের ডিক্রির খবর পায় সে তার এক শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গা ঢাকা দেয়।

লোক দুটো লোহার গেটের দশ হাতের মধ্যে পৌঁছতে হাঁক দিতে উদ্যত হলো ম্যাসেগনা, কিন্তু মুখ খোলার সময় পেল না। পলকে সিবেলের হাতে একটা মিনি-উজি বেরিয়ে আসতে দেখল সে তার ওভারলের পকেট থেকে। একদম সামনে থেকে ব্রাশ ফায়ার করে ম্যাসেগনার বুক ঝাঁঝরা করে দিল সিবেলে। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল লা টামবিয়ের। একইসঙ্গে সগর্জনে স্টার্ট নিল বুলডোজারটা। নাক ঘুরিয়ে গেটের দিকে ছুটে এল হাঁ হাঁ করে। তার প্রচণ্ড ধাক্কায় দুর্ভেদ্য লা টামবিয়েরের পুরো লোহার তৈরি প্রধান গেট হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। উন্মুক্ত হয়ে পড়ল প্রবেশপথ।

ভেতর থেকে ঘুম জড়ানো চোখে ছুটে বেরিয়ে এল অন্য গার্ডরা। কিন্তু কেউ ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধরাশায়ী হলো তারা সিবেলে এবং তার সঙ্গীর ব্রাশ ফায়ারে। পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখে বাকি শ্রমিকরাও কাজ ফেলে উঠে এল। সবার হাতে শোভা পাচ্ছে একটি করে মিনি-উজি।

এরা প্রত্যেকে নিষিদ্ধ নিরাপত্তা পুলিসের সদস্য।

সিবেলের নেতৃত্বে বীরদর্পে কারাগারের ভেতরে ঢুকে পড়ল তারা। দৌড়ে চলল জা ভুলির সেলের দিকে। ওটার বন্ধ গেটের সামনে দুজন গার্ড ছিল, ম্যাসেগনা অস্ত্র তোলার আগেই আত্মসমর্পণ করল তারা। পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল হাতের রাইফেল। পরের কাজটুকু সারতে এক মিনিটও লাগল না সিবেলের। জা ভুলিকে বাইরে নিয়ে এসে গার্ড দুজনকে সেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিল সে, তারপর দু'তিনজন মিলে প্রাক্তন চীফকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে ছুটল।

ভোরের দিকে কোনডেসি পৌঁছুল তারা সড়ক পথে। মাঝে তিনবার গাড়ি বদল করেছে সিবেলে। সব আগে থেকেই ঠিকঠাক করা ছিল, কোন অসুবিধে হয়নি। কোনডেসিতে অপেক্ষমাণ কয়েকশো চাকরি হারা নিরাপত্তা পুলিস প্রাক্তন চীফকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে মাতোয়ারা হয়ে পড়ল আনন্দে।

জা ভুলির নির্দেশ পেলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে তারা।

পাঁচ

স্ট্রাইক ফোর্সের ত্রিশজন কম্যাণ্ডো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কেনেডি এয়ারপোর্টের সর্বত্র। এদের মধ্যে পনেরোজন স্নাইপার। প্রত্যেকের হাতে একটি করে এম সিক্সটিন রাইফেল, সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কভার করছে

তারা টেলিস্কোপে চোখ রেখে।

লোকবলের কথা ভেবে পুলিসের সাহায্যও নিতে হয়েছে রানাকে এ ক্ষেত্রে। রামেল নগুয়েনের বিমান থেমে দাঁড়ানোর নির্দিষ্ট জায়গাটুকু বড় একটা বৃত্তের আকারে ঘিরে রেখেছে তারা, ভাইস স্কোয়াডের এক কুড়ি সদস্য। সবার হাতে হ্যাণ্ডগান এবং রাইফেল। কড়া নির্দেশ আছে তাদের ওপর, ইউনাকোর অফিশিয়াল পাস ছাড়া কাউকেই ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়া যাবে না। কাউকেই না।

ঘুরে ঘুরে নিরাপত্তার আয়োজন দেখল মাসুদ রানা। সব ওর নির্দেশ মতই হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হলো। জিম্বালান প্রেসিডেন্টের বিমান পৌঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা বাকি তখনও। বৃত্তের সামান্য দূরে বাম্পারে বাম্পার ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এনওয়াইপিডির ভাইস স্কোয়াডের ছাপমারা চারটে কার।

তার অনতিদূরে এক সারিতে আরও চারটে লিমুজিন। রামেল নগুয়েন এবং তাঁর সফরসঙ্গী ও বডিগার্ডদের জন্যে। বুলেটপ্রুফ। কালো কাঁচের জন্যে ভেতরটা ঠিকমত দেখা যায় না। প্রতিটি লিমোর নিচে কয়েক সারি তীক্ষ্ণধার স্টীলের দীর্ঘ স্পাইক রয়েছে। গাড়ি উল্টে দিয়ে আরোহীকে হত্যা করার কোন প্রচেষ্টা নেয়া হলে, ড্রাইভার একটা সুইচ টিপলেই বেরিয়ে পড়বে ওগুলো। গেঁথে যাবে রাস্তায়, লিমোর পতন রোধ করবে।

ওখানে জটলা করছে বিদেশী প্রেসিডেন্টের অভ্যর্থনা পার্টির সদস্যরা। জিম্বালার পক্ষে পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাতিসংঘে সে দেশের প্রতিনিধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হোয়াইট হাউসের চীফ অভ প্রোটোকল। জটলার সামান্য তফাতে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মাইক গ্রীন এবং আলবার্ট হিল। মার্ক গর্ডনের লোক ওরা।

সিআইএর 'বুলেট ক্যাচার'। জিমি কার্টারের বডিগার্ড বাহিনীতে ছিল এরা দুজন। আজই ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রানার। লোক দুটো রানাকে

পরিষ্কার টের পাইয়ে দিয়েছে যে ওকে কেয়ার করে না তারা। রানাও তেমনি। বুঝিয়ে দিয়েছে, ওর নির্দেশ ছাড়া এক পা এদিক-ওদিক করলে ঘাড় ধরে টীম থেকে বের করে দেয়া হবে। সামান্যতম বেচালও সহ্য করা হবে না।

হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাল মাইক গ্রীন, চোখাচোখি হলো মাসুদ রানার সঙ্গে। অভিব্যক্তিহীন মুখে চেয়ে থাকল লোকটা কয়েক মুহূর্ত, তারপর ঠোঁট না নাড়িয়ে কিছু বলল হিলকে। এদিকে ফিরে হাসল হিল। প্রয়োজনের সময় দেখব, মনে মনে রানাও হাসল, কে কতবড় 'বুলেট ক্যাচার'।

মুখ ঘোরাল রানা। একটি আফ্রিকান মেয়ের ওপর চোখ পড়ল। আঠারো-উনিশ হবে বয়স। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা। গায়ের রঙ হালকা কালো। চকচকে ত্বক। নীল স্কার্ট ও সাদা ব্লাউজে চমৎকার লাগছে তাকে পড়ন্ত রোদের আলোয়। জিম্বালান মিশনের সদস্য মেয়েটি, দোভাষী। জিম্বালার রাষ্ট্রীয় ভাষা সোয়াহিলি এবং ফ্রেঞ্চ। বিদেশে জিম্বালানরা ইংরেজিতে কথা বলে না, যে কারণে প্রয়োজন পড়েছে মেয়েটির।

মেয়েটিও তাকাল এবার রানার দিকে। ভদ্রতার খাতিরে ঠোঁটে খানিকটা হাসি ফোটাল ও। পাল্টা হাসি দিল যুবতী, পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। ভাব দেখে মনে হলো অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে যেন রানার কাছে। হঠাৎ করে জেনির কথা মনে পড়ল রানার। আজ টেলিফোন করার কথা ছিল রানার জেনিকে। ইশ্! মনে মনে জিভ কাটল রানা। ব্যস্ততার জন্যে একেবারে ভুলেই বসে আছে রানা ওর কথা। নিশ্চয়ই মন খারাপ করে বসে আছে বেচারী।

জেনি মাইকেল ফিশারের একমাত্র নাতনী, জেনি আরনল্ড। বয়স চোদ্দ। বছরখানেক হলো বিপত্নীক নানার সংসারে এসে উঠতে বাধ্য

হয়েছে জেনি। গেল বড়দিনের শপিং সেরে সবাই মিলে বাসায় ফেরার পথে মারাত্মক এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মা দুজনই নিহত হয় জেনির। ওর-ও বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তাররা। শেষ পর্যন্ত প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল মেয়েটি। সুস্থ হয়ে উঠলে জেনিকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন মাইকেল ফিশার।

বাপ-মা হারানোর শোক মেয়েটিকে পাথরে পরিণত করে রেখেছিল কয়েকমাস। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম এবং নানার স্নেহ ভালবাসায় ক্রমান্বয়ে সহজ হয়ে এল জেনি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ফিশার। নতুন করে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন নাতনীকে। এর মধ্যে গ্যাপ পড়ে গেছে এক বছর। ঝামেলা বাধল অন্যদিকে। নিজে ফিশার ব্যস্ত মানুষ। দিনে দূরের কথা, রাতেও সবদিন জেনির খোঁজ খবর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

মাথার ওপর খবরদারীর কেউ না থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা হয়, তাই হলো। কুসঙ্গে পড়ে বখে গেল মেয়েটি। ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পাননি ফিশার। আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক যেদিন পুলিস স্টেশন থেকে ফোন করে তাঁকে জানানো হলো যে ম্যানহাটনের এক হেরোইনখোরদের আখড়ায় অভিযান চালিয়ে অন্য অনেকের সঙ্গে জেনি আরনল্ডকেও ড্রাগ গ্রহণ করার সময় হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। ইউনাকোয় রানার জয়েন করার কয়েকদিন পরের ঘটনা এটা।

ক্ষোভে দুঃখে আর লজ্জায় কাউকেই ব্যাপারটা জানতে দিলেন না ফিশার। নাতনীকে ছাড়িয়ে আনার কোন উদ্যোগও নিলেন না। তিনি চেপে রাখতে চাইলেও চাপা থাকল না খবরটা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টিভির মাধ্যমে জেনে গেল সবাই। পরে বাধ্য হয়ে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে আনতে গেল মাসুদ রানা ও লিওনিদ কলচিনস্কি।

ওখানে জেনি আরনল্ডকে দেখামাত্র চমকে উঠেছিল রানা। দীর্ঘক্ষণ হাঁ

করে চেয়ে ছিল ও মেয়েটির দিকে। চুল এবং চোখের রঙ ছাড়া জেনি যেন অবিকল লুবনা। লুবনা আভান্তি। তেমনি হালকা-পাতলা গড়ন। বড় বড় দু চোখে কী এক গভীর বেদনার ছাপ। মুহূর্তে ভালবেসে ফেলল রানা জেনিকে। খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হলো এ লাইনে খুব বেশি দিন হয়নি মেয়েটির, চেষ্টা করলে এখনও শোধরানো সম্ভব। দায়িত্বটা রানা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিল।

নিজগুণে প্রথমদিনই জেনির মন জয় করে নিল রানা পুরোপুরি। বেশি বেগ পেতে হলো না পরের কাজটুকু সারতে। কারণ প্রথমেই বুঝে নিল রানা যে মেয়েটি লুবনার মতই নিঃসঙ্গ। ওর মতই স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল। সেই পথেই এগোল রানা। শেষে এমন অবস্থা হলো যে কাজের চাপে দেখা করার সুযোগ না হলে সকালে এবং রাতে রোজ দু'বার টেলিফোনে ওর সঙ্গে ঘন্টাখানেক গল্প না করলে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে জেনি। সবচেয়ে বড় কথা, ড্রাগকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শিখেছে সে এখন।

কেউ একজন চেঁচিয়ে কিছু বলে উঠতে ধ্যান ভাঙল মাসুদ রানার। এসে পড়েছে প্রেসিডেনশিয়াল প্লেন। চুরুটের মত মনে হচ্ছে ওটাকে দূর থেকে, ধপধপে সাদা একটা গালফস্ট্রীম ওয়ান। চূড়ান্ত চক্কর শেষ করে নেমে আসতে শুরু করেছে। আগে থেকে ঠিক করা প্ল্যান অনুযায়ী পুলিস অফিসাররা রানওয়ের একদিক মুক্ত করে অর্ধবৃত্তের আকার নিল। খোলা পথে ভেতরে এসে দাঁড়াবে প্লেন। তারপর আবার আগের অবস্থানে ফিরে যাবে তারা। এবার মাইক গ্রীন ও আলবার্ট হিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দুজনেই একবার করে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু বলল না কিছু।

অবতরণ করল খুদে গালফস্ট্রীম ওয়ান। ট্যাক্সি করে ভাইস স্কোয়াডের বেষ্টনীর মধ্যে এসে থেমে দাঁড়াল। বিমানটির ফিউজিলাজে নীল, লাল এবং সাদা, আড়াআড়ি তিনটে চওড়া স্ট্রাইপ সম্বলিত জিম্বালার পতাকা আঁকা।

ওর নিচে বড় করে লেখা 'এয়ার জিম্বালা'। হ্যাচ খুলে গেল। আগে থেকে প্রস্তুত চার ধাপের ছোট একটা গ্যাঙওয়ে এগিয়ে গিয়ে অবস্থান নিল ওটার দোরগোড়ায়।

হোয়াইট হাউসের চীফ অভ প্রটোকল সদলবলে এগিয়ে গেলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রেসিডেন্ট রামেল নগুয়েনের বেরিয়ে আসার। একজনকে মাথা নিচু করে বের হতে দেখা গেল। গ্যাঙওয়ের মাথায় এসে সিধে হলো লোকটা। ছয় ফুট ছয় ইঞ্চির কম হবে না এ লোক, অনুমান করল মাসুদ রানা। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে আবার প্লেনের ভেতর সেঁধিয়ে গেল সে। মুহূর্তখানেক পরই ফের বেরিয়ে এল। লম্বুর ঠিক পিছনেই রামেল নগুয়েনকে দেখতে পেয়ে মুচকি হাসি ফুটল রানার মুখে।

দীর্ঘদেহী, হ্যাণ্ডসাম। চমৎকার ছাঁটের গ্রে ডায়র কমপ্লিট সুটে দারুণ মানিয়েছে প্রেসিডেন্টকে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এ লোক নির্ভীক, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী। চোখে গাঢ় সানগ্লাস। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে চশমা খুললেন প্রেসিডেন্ট রামেল। ততক্ষণে তাঁর পাশে স্থান করে নিয়েছে দোভাষী যুবতীটি। রানার দিকে তাকিয়ে ছিল গ্রীন এবং হিল, ও মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করতে এগিয়ে গেল তারা। প্রেসিডেন্টের দুপাশে অবস্থান নিল।

হাসিমুখে চীফ অভ প্রটোকলের বাড়ানো হাত নিজের মস্ত থাবায় পুরে ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন মিশনের অন্যান্যদের সঙ্গে করমর্দন সেরে নিজ দেশের মিশনের সবার সঙ্গে হাত মেলালেন। এরপরই মাসুদ রানার ওপর চোখ পড়ল তাঁর। প্রথমে বিস্মিত হলেন প্রেসিডেন্ট, পরক্ষণেই চওড়া হাসি ফুটল মুখে। গ্রীন আর হিল ব্যাপার বুঝতে না পেরে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

হাত ইশারায় ওদের দুজনকে সঙ্গে আসতে নিষেধ করে রানার দিকে পা বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট। রানাও এগোল কয়েক পা। ওর বাড়ানো হাতটা

প্রবলবেগে ঝাঁকাতে লাগলেন র‍্যামেল নগুয়েন। ঐতিহ্য ভেঙে ঝরঝরে ইংরেজিতে বললেন, 'অনেকদিন পর দেখা, মিস্টার রানা।' হাসিটা ততক্ষণে আরও প্রশস্ত হয়েছে।

রানার মুখেও হাসি ফুটল। তবে খানিকটা আড়ষ্ট হাসি। 'হ্যাঁ, অনেকদিন।' আর কি বলবে এক মুহূর্ত ভাবল ও। 'চমৎকার লাগছে আজ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ।'

প্রেসিডেন্টের কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। গ্রীন এবং হিলকে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসার নির্দেশ দিল। ওদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা তাঁর সঙ্গে। আর প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত গার্ড লম্বু, সে থাকল ঠিক তাঁর পিছনে। তাকেও ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। লোকটির নাম সৈমিলা, সোয়াহিলি ভাষায় যার অর্থ পাহাড়।

'আমি আপনার সিকিউরিটি-ইন-চার্জ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার,' বলল রানা নিজের উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। দুই বুলেট ক্যাচারকে দেখিয়ে বলল, 'এদের মত আপনার বডিগার্ডদেরও সরাসরি আমার কাছে রিপোর্ট করতে হবে।'

'বেশ।' সোয়াহিলি ভাষায় পাহাড়কে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে আর যে কজন গার্ড রয়েছে, তাদেরকেও জানিয়ে দিতে বললেন। মাথা দোলাল লোকটা।

রানার নির্দেশে গ্রীন এবং হিল উঠল প্রথম লিমুজিনে। 'আপনি, মিস্টার অ্যামবেসেডর আর আমি দ্বিতীয়টায়, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনি তৃতীয় লিমুজিনের সামনের সীটে,' ঘুরে সেমিলাকে বলল রানা। 'পিছনে বসবেন ইন্টারপ্রিটার। আপনার বাকি সঙ্গীরা শেষেরটায়।'

প্রেসিডেন্টের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট গাড়ির পিছনের দরজা মেলে ধরল মাসুদ

রানা। ওপাশের দরজা দিয়ে শোফারের সহায়তায় উঠলেন রাষ্ট্রদূত। রানা বসল ড্রাইভারের পাশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে স্টার্ট নিল লিমুজিন। প্রথমটা ধীরগতিতে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। এবার বাকিগুলোও রওনা হলো। এয়ারপোর্ট এলাকা ছেড়ে গাড়ি রাস্তায় উঠতে পিছন ফিরল মাসুদ রানা। প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে বলল, 'মাঝখানের বুলেটপ্রুফ গ্লাস পার্টিশনটা তুলে দিচ্ছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। এতে মিস্টার অ্যামবেসেডরের সঙ্গে প্রাইভেটলি আলোচনা চালাতে সুবিধে হবে আপনার। আপনার সামনের বাঁ দিকের কম্পার্টমেন্টে টেলিফোন সেট আছে। যেখানে ইচ্ছে ফোন করতে পারবেন। ডান দিকেরটা লিকার কেবিনেট। প্লীজ, হেলপ ইওরসেল্ফ, স্যার, ইফ ইউ নীড। আর আমাকে প্রয়োজন হলে শুধু জিরো ডায়াল করবেন।'

মুচকে হাসলেন প্রেসিডেন্ট রামেল নগুয়েন। 'শিওর, মিস্টার শার্লক হোমস।' অক্সফোর্ড কেলেঙ্কারির হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার পর একদিন উচ্ছ্বসিত রামেল এই উপাধি দিয়েছিলেন রানাকে। কথাটা মনে পড়তে ও-ও হাসল। ড্যাশবোর্ডের একটা বোতাম চেপে দিল মাসুদ রানা, মাঝখান থেকে উঠে এল সাউণ্ডপ্রুফ-কাম-বুলেটপ্রুফ গ্লাস পার্টিশন। প্রথম লিমুজিনটার সামনেই রয়েছে একটা পুলিস কার। তার সামনে হেলমেট পরা বিশালদেহী দুই রাইডার। গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে ছেড়ে ম্যানহাটনের দিকে ছুটল শোভাযাত্রা। বড় রাস্তায় উঠে আপনাআপনি গতি বেড়ে গেছে বহরের।

লঙ আইল্যাণ্ড সিটি পেরিয়ে কুইনস্‌বোরো ব্রিজে উঠল ওরা। ব্রিজ অতিক্রম করেই ম্যানহাটন। ডানে বাঁক নিয়ে ফার্স্ট অ্যাভিনিউতে পড়ল শোভাযাত্রা, ছুটল হোটেল ইউনাইটেড নেশনস্ প্লাজার উদ্দেশে। যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানকালে ওখানেই থাকবেন প্রেসিডেন্ট রামেল। হোটেলটা জাতিসংঘ

ভবনের খুব কাছে। তাছাড়া আফ্রিকান-আমেরিকান ইনস্টিটিউটও ওর থেকে মাত্র তিন ব্লক দূরে। সফরসূচী অনুযায়ী কাল সকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবেন জিম্বালার প্রেসিডেন্ট। পরে ইনস্টিটিউটেও যাবেন তিনি।

হোটেলের সামনে থেমে পড়ল গাড়ির বহর। গ্লাস পার্টিশন আগেই নামিয়ে দিয়েছিল রানা। ঘাড় না ফিরিয়ে প্রেসিডেন্টকে সংক্ষেপে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত গাড়ি ত্যাগ করল ও। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল। প্রেস ফটোগ্রাফারদের অস্বাভাবিক বড় ভিড় দেখে কপাল কুঁচকে গেল রানার। গতকাল অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক টেলিফোনে রয়টারকে প্রেসিডেন্ট রামেল নগুয়েনকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছে। তাই এত ভিড়।

অজস্র ক্যামেরা। সবার আশা, এক্সক্লুসিভ দৃশ্যটা বন্দী করবে নিজের ক্যামেরায়। দুই রাইডারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল মাসুদ রানা, ফটোগ্রাফারদের ভিড়টা কয়েক ফুট পিছনে হটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। ওদিকে গ্রীন, হিল এবং সেমিলা প্রেসিডেন্টের গাড়ি আগলে দাঁড়িয়ে আছে। সেমিলার সঙ্গী বাকি তিন গার্ডও কাছাকাছি রয়েছে। সবার নজর ঘন ঘন স্থান বদল করছে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত।

মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো রানা। সেমিলার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। তারপর প্রেসিডেন্টের দিকের দরজাটা মেলে ধরল সে। হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন রামেল নগুয়েন। টাইয়ের নট্ ঠিক করে ফটোগ্রাফারদের লক্ষ করে হাত নাড়লেন। অনবরত 'ক্লিক' আর ফ্ল্যাশের ঝলকে মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল হোটেলের বিশাল পোর্টিকো। একটা হাত তুলে চোখ আড়াল করল মাসুদ রানা, প্রেসিডেন্টের গা ঘেঁষে এগিয়ে নিয়ে চলল তাঁকে।

ওরই ফাঁকে ব্যাপারটা চোখে পড়ল রানার। ফটোগ্রাফারদের ভিড়ের

মধ্যেই এক লোককে দেখা গেল ঠেলাঠেলি করে সামনে আসার চেষ্টা করতে। কয়েকজনকে গুঁতো মেরে পলকে আগে চলে এল লোকটি। তার হাতের জিনিসটা ক্যামেরা নয়, একটা পয়েন্ট থ্রী এইট স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন।

চেঁচিয়ে সবাইকে সতর্ক করল মাসুদ রানা, পরমুহূর্তে ল্যাঙ মেরে শানের ওপর দড়াম করে আছড়ে ফেলল রামেলকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই রানার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘাতকের প্রথম বুলেট। পিছনের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল ওটা। একই সঙ্গে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর, নিজের দেহ দিয়ে তাঁকে আড়াল করার চেষ্টায়। রানার চিৎকার শেষ হওয়ার আগেই অস্ত্রধারীকে দেখতে পেয়েছে আরেক জিম্বালান বডিগার্ড, সে-ও চেঁচিয়ে উঠেই ঝাঁপ দিল ভিড় লক্ষ করে।

কড়াৎ!

মাটি ছোঁয়ার আগেই বুকে বুলেটবিদ্ধ হলো গার্ডটি। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল সে মুখ থুবড়ে। হাতের অস্ত্র ফেলে বুক চেপে ধরে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। এত কিছু ঘটতে পুরো এক সেকেণ্ডও লাগেনি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ফটোগ্রাফারদের মধ্যে, ছবি তোলা ছেড়ে যে যার প্রাণ নিয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে তারা।

ওদিকে বিপদ বুঝতে পেরে ততক্ষণে হোটেলের মেইন গেট লক্ষ করে তীরবেগে ছুট লাগিয়েছে অস্ত্রধারী। গেটের বাইরে তার জন্যে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অপেক্ষা করছে একটি নীল ফোর্ড, প্রস্তুত হয়ে বসে আছে ওটার চালক। এপাশের সামনের দরজাটা খোলা। বাকি দুই জিম্বালান বডিগার্ড ধাওয়া করল লোকটিকে। কিন্তু কয়েক গজের বেশি এগোতে পারল না তারা। ফোর্ডের ভেতর থেকে আচমকা গর্জে উঠল আরেকটা অস্ত্র। গার্ডদের ভয় দেখানোর জন্যে চার-পাঁচটা গুলি ছুঁড়ল ড্রাইভার। আত্মরক্ষার জন্যে

শুয়ে পড়তে বাধ্য করল ধাওয়াকারীদের।

পরক্ষণেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ফোর্ডের খোলা দরজাটা, উঠে পড়েছে পলায়নপর অস্ত্রধারী। রাস্তায় টায়ারের দাগ রেখে সামনের দিকে লাফ দিল ফোর্ড, তুমুল গতিতে ছুটল পুব দিকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। এরমধ্যে হোটেলের একদল সিকিউরিটি পুলিস দৌড়ে এসে ঘিরে ফেলেছে রামেল নগুয়েনকে।

চেঁচিয়ে প্রেসিডেন্টকে তাঁর ফ্লোরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল রানা সবাইকে লক্ষ করে। তারপর এক দৌড়ে গিয়ে চড়ে বসল অপেক্ষমাণ একটি পুলিস মোটর সাইকেলে। এক হাজার সি সি-র দৈত্যাকার গাড়ি। স্টার্টার বাটন টিপে দিয়েই গিয়ার দিল মাসুদ রানা, চোখের পলকে একশো আশি ডিগ্রি পাক খাওয়াল ওটাকে, ঘুরে গেল উল্টোদিকে। ফোর্ডটাকে ধাওয়া করল ও। অনেকটা এগিয়ে গেছে তখন ওটা। বাতাসের তোড়ে চোখ আধবোজা হয়ে এল রানার, চেষ্টা করেও মেলে রাখতে পারছে না। ওরই মাঝে অনেক কষ্টে ধাবমান ফোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা পড়ল ও।

বাঁ দিকে হ্যাণ্ডেলের হুকে ঝোলানো রেডিও সেটটার ওপর চোখ পড়ল এই সময়। থাবা দিয়ে জিনিসটা মুখের সামনে নিয়ে এল রানা, ফোর্ডের নাম্বার এবং বর্ণনা দিয়ে ওটাকে আটক করার জন্যে পুলিস পেট্রলকারের সাহায্য চাইল। মেসেজটা পরপর কয়েকবার রিপিট করল রানা। ছুটতে ছুটতে যেন হঠাৎ করেই মত পরিবর্তন করল ফোর্ড, কম করেও একশো মাইল বেগে আচমকা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ইস্ট থার্টি ফোর্থ স্ট্রীটে সেঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু প্রয়োজনের সময় গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি ড্রাইভার, ফুটপাতের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল। ওপাশে দুই চাকা উঠে পড়েছে ফুটপাতে। প্রাণপণ চেষ্টা চালাল ড্রাইভার, কিন্তু কাজ হলো না

তাতে। শেষ উপায় হিসেবে ব্রেকের ওপর কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তবু গতি একচুল কমল না ফোর্ডের। দড়াম করে আবার রাস্তায় পড়ল ফুটপাতের দুই চাকা, নিক্ষিপ্ত তীরের মত কোনাকুনি চওড়া রাস্তা অতিক্রম করে সেকেণ্ড অ্যাভিনিউর দিকে ছুটল।

পথের দুপাশের জনতা সামনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সভয়ে চোখ বুজল। সেকেণ্ড অ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়ে আসা একটি দ্রুতগতি গ্রেহাউণ্ড বাসের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল ফোর্ড। ধাক্কা খেয়েই পর পর দুটো ডিগবাজি দিল, তারপর একটা মালবোঝাই ভ্যানের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ওটাকে নিয়েই উল্টে গেল পথের মাঝখানে। গ্রেহাউণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়েছে ড্রাইভারের। স্টিয়ারিঙ হুইলের রড এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তার বুক। গেঁথে ফেলেছে দেহটা সীটের সঙ্গে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোমরের সীটবেল্ট খুলে ফেলতে সক্ষম হলো অন্যজন। কয়েক জায়গায় কেটে গেছে মুখ, মাথা আর কপাল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে, চেহারা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। জানালা গলে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এল লোকটা। কয়েকজন পথচারী ছুটে এল সাহায্য করার জন্যে, হাত ধরে টেনে তুলল তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই লোকটিকে অস্ত্র উঁচিয়ে তাদের উদ্দেশে দাঁত খিঁচাতে দেখে জান উড়ে গেল সবার। যে যেদিকে পথ পেল ছুটে পালাল।

সামনে ফাঁকা পেয়ে দৌড় দিতে গিয়েও থেমে পড়ল অস্ত্রধারী। পিছনে এসে পড়েছে বিপজ্জনক রাইডার। ঘুরেই গুলি করল লোকটা, বিকট শব্দে ফেটে গেল বাইকের সামনের চাকা। রানাও বের করে হাতেই রেখেছিল অস্ত্র, কিন্তু ট্রিগার টানার সময় পেল না। স্যাঁৎ করে সামনের চাকা ঘুরে গেল, গতি সামাল দিতে না পেরে আছড়ে পড়ল ও। রাস্তায় ঘষা খেয়ে প্রায় পুরো হাঁটুর চামড়া ছড়ে গেল। এইবার প্রাণ বাজি রেখে ছুটল লোকটা।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, আবার ধাওয়া করল তাকে। যথাসম্ভব দ্রুত ছোটার চেষ্টা করল ও, কিন্তু কাজ হলো না। আহত পায়ের জন্যে এগোতে পারছে না। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান একটু একটু করে বেড়েই চলেছে। হাজার চেষ্টা করেও গতি বাড়াতে পারল না মাসুদ রানা। প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা বাড়ছে, অজান্তেই কাতরানি বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে।

এই সময় আচমকা বাধা পেল সামনের লোকটা। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো তিন তিনটে স্কোয়াড কার। ব্রেক কষল লোকটা। ঘুরে অন্যদিকে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সাইরেনের উচ্চকিত আওয়াজ তুলে আরও তিন-চারটা স্কোয়াড কার পৌঁছে গেল, আক্ষরিক অর্থেই ঘেরাও করে ফেলল তাকে।

চারদিক থেকে বুল হর্নে চড়া কণ্ঠের হাঁক আসছে তার কানে। 'ড্রপ দ্য গান! ড্রপ দ্য গান!' দু পাশের দালান-কোঠায় আঘাত খেয়ে বিকট প্রতিধ্বনি তুলছে শব্দটা।

সিধে হয়ে দাঁড়াল লোকটা। বুঝে ফেলল লাভ নেই পালাবার চেষ্টা করে। আবার ধরা পড়লেও চলবে না। মাসুদ রানার চোখে চোখ রেখে ঝট্ করে নিজের ওয়ালথার ফাইভ পি পিস্তল তুলল সে, কানের সামান্য ওপরে ঠেকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার। মাটিতে আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল তার দেহ। কোটের হাতায় কপালের ঘাম মুছে পায়ে পায়ে লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাটু মুড়ে বসে আঙুল দিয়ে কণ্ঠনালীর পাশের ধমনী স্পর্শ করল পালসের আশায়। নেই। স্থির হয়ে গেছে ধমনী।

ছয়

মাসুদ রানাকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন লিওনিদ কলচিনস্কি। লাউঞ্জে শুকনো মুখে বসে ছিলেন তিনি, আলাপ করছিলেন এক পুলিস অফিসারের সঙ্গে। 'কি অবস্থা, রানা? কোথাও লাগেনি তো তোমার?'

'সামান্য লেগেছে হাঁটুতে। ও কিছু নয়। ধন্যবাদ।' বৃদ্ধের কণ্ঠে অকৃত্রিম উদ্বেগ টের পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। 'প্রেসিডেন্ট কেমন আছেন?'

'চমৎকার! ভাব দেখে মনে হয় কিছুই ঘটেনি। এরকম কড়া নার্ভের মানুষ খুব কমই দেখেছি আমি।'

'আপনি কখন এলেন? কে খবর দিল?'

'খবর দিতে হয়নি। গুলির শব্দ শুনেই ছুটে এসেছি আমরা। ফিশার আছে ওপরে। চলো যাই। প্রেসিডেন্ট তোমার অপেক্ষায় আছেন।'

প্রেসিডেন্ট রামেলের জন্যে নির্দিষ্ট লিফটে ওঠার মুখে যার যার পরিচয়পত্র বের করে দেখাতে হলো দোরগোড়ায় দাঁড়ালো পাথরমুখো দুই পুলিস সার্জেন্টকে। ত্রিশ তলায় উঠে এল ওরা। করিডরে পা রাখতে আরেক জোড়া পুলিস। কার্ড দুটোর ওপর চোখ বুলিয়ে পথ ছেড়ে দিল তারা। এদিক-ওদিক তাকাল রানা। চারদিকে শুধু পুলিস আর পুলিস। পুরো ফ্লোর

ছেড়ে দেয়া হয়েছে জিম্বালান প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের জন্যে।

রামেল নগুয়েনের সুইটের দরজায় নক করল মাসুদ রানা। দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল সেমিলা, রানাকে দেখামাত্র পুরো মেলে ধরল দরজা। মুখোমুখি দুই সোফায় বসে আছেন প্রেসিডেন্ট এবং মাইকেল ফিশার। ওদের দেখে হাঁফ ছাড়লেন ফিশার। 'থ্যাঙ্ক গড!'

আসন ছাড়লেন রামেল। রানার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। 'আজ আরও একবার আমার জীবন বাঁচালেন আপনি, মিস্টার রানা। শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করব না। আমি কৃতজ্ঞ।'

'ও কিছু নয়,' অস্বস্তি বোধ করল রানা। 'আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে আসলে আপনার গার্ডটি।'

'মবুতু,' হাত ইশারায় রানা ও লিওনিদকে বসতে বললেন তিনি। 'জ্ঞান ফেরার আগেই মৃত্যু হয়েছে মবুতুর।' বসলেন রামেল। 'অন্তত ভোগান্তির হাত থেকে বেঁচে গেছে সে।'

'আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ।'

আনমনে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে যাচ্ছিলেন ম্যাইকেল ফিশার। হঠাৎ থেমে গেলেন। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ক্যান আই...?'

'শিওর শিওর! আপনাদের কোন ড্রিঙ্ক অফার করতে পারি?'

দুই বৃদ্ধকে সবিনয়ে মাথা দোলাতে দেখে রানার দিকে ফিরলেন রামেল নগুয়েন। 'মিস্টার রানা?'

'না, ধন্যবাদ। গ্রীন আর হিল কোথায়?'

'ওদের পাশের রুমে বসতে বলেছি আমি।'

'অন্তত দু'জন গার্ড সবসময় সঙ্গে থাকা দরকার আপনার,' মন্তব্য করল

রানা।

'মিস্টার রানা, পুরো ফ্লোরের যেদিকেই চোখ গেছে, পোকার মত কিলবিল করছে পুলিস আর পুলিস। তার ওপর এরাও যদি...টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, নিজেকে আমার বন্দী মনে হচ্ছে।'

'আমি হেলপ্‌লেস, স্যার। তবুও সবসময় দুজন বডিগার্ড সঙ্গে রাখা দরকার। আপনার নিরাপত্তার স্বার্থেই।'

মজা পেয়ে গেলেন যেন রামেল। 'যখন আমি ঘুমাব, তখন?'

'তখনও থাকবে ওরা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি আমি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আপনাকে হত্যা করতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও এক মুহূর্ত দ্বিধা করবে না ওরা। এবং কাজটা সারতে যতদূর যেতে হয়, যাবে খুনীর দল।'

'ঠিক কি মীন করতে চাইছেন আপনি?'

তাঁকে হত্যা করতে ব্যর্থ লোকটির আত্মহত্যার কথা জানিয়ে বলল রানা, 'এমনকি এই রুমেও নিরাপদ নন আপনি। জানালা দিয়েও আসতে পারে ওরা।'

হেসে ফেললেন রামেল নগুয়েন। 'আশঙ্কাটা বাড়াবাড়িরকম বেশি হয়ে যাচ্ছে না, মিস্টার রানা? আমি ত্রিশতলায় আছি, ফর গডস সেক!'

'নো, স্যার,' বলে উঠলেন লিওনিদ। 'ঠিকই বলেছেন উনি। মোটেই বাড়াবাড়ি আশঙ্কা নয়।'

কয়েক সেকেণ্ড তাঁর দিকে চেয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রানাকে বললেন, 'ভেরি ওয়েল। আপনি যা বলেন।'

'কোন রুমে আছে ওরা দুজন?' উঠে দাঁড়াল রানা।

নিজের বাঁ দিক নির্দেশ করলেন রামেল। 'ওই রুমে।'

সুইট থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। নির্দেশিত রুমের দরজায় নক্ করল। দরজা খুলল গ্রীন। হাতে রঙিন পানীয়ের গ্লাস। রুমের মাঝখানে টেবিলে কার্ড বিছিয়ে পেশেন্স খেলছে হিল। চোখ তুলে তাকাল সে দরজার দিকে। বুকে হাত রেখে ঠেলে গ্রীনকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল মাসুদ রানা। নিজেও ঢুকল। 'তোমরা এ রুমে কেন?' দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল ও।

'হোয়াট!' ভুরু কোঁচকাল হিল।

'কালা নাকি? এ রুমে কেন তোমরা তার ব্যাখ্যা চেয়েছি, শোনোনি?'

'প্রেসিডেন্ট আমাদের এখানে বসতে বলেছেন,' বলল গ্রীন।

'বললেন আর অমনি এসে তাস আর মদ নিয়ে বসে পড়েছ। তোমাদের উচিত ছিল না তাঁকে বোঝানো যে তাঁর সঙ্গেই তোমাদের থাকা দরকার? তোমাদের প্রফেশনাল ভেবেছিলাম আমি, আশ্চর্য!'

গজ গজ করতে করতে উঠে দাঁড়াল হিল। 'চলো হে!' গ্রীনের উদ্দেশে বলল টিট্‌কিরির সুরে। 'পড়েছি মহা জ্বালায়। একজন বলবে এদিক যাও, আরেকজন এসে মেজাজ দেখিয়ে বলবে...'

কথাটা শেষ করতে দিল না হিলকে মাসুদ রানা। থাবা দিয়ে কোটের দুই ল্যাপেল মুঠো করে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। ওই অবস্থায় ঘুরে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল হিলকে। 'মেজাজ দেখাবার মত কাজ করেছ বলেই দেখাচ্ছি, স্টুপিড! কে কি বলল শোনার কথা নয় তোমাদের। শুধুমাত্র আমার নির্দেশ পালন করে যেতে হবে তোমাদের বিনা প্রশ্নে। তাতে যদি লজ্জা করে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও হোটেল ছেড়ে। তোমাদের ছাড়াই চলবে আমার। বোঝা গেছে?'

রাগে, অপমানে মুখ রাঙা হয়ে উঠল হিলের। চোখ গরম করে রানার দিকে চেয়ে থাকল সে। ওদিকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল গ্রীন, দরজার কাছে গিয়ে বেকুবের মত হাঁ করে চেয়ে আছে এদিকে। ছেড়ে দিল

রানা হিলকে। 'মুভ!'

কয়েক মুহূর্ত অগ্নিবর্ষণ করল লোকটা রানার মুখের ওপর। তারপর গট গট করে বেরিয়ে গেল। গ্রীনও গেল পিছন পিছন। প্রেসিডেন্টের রূমে ঢুকে দুজন দুটো চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল গ্যাঁট হয়ে। রানা ঢুকেছে বুঝতে পেরেও মুখ ঘোরাল না কেউ। সোফায় বসতে গিয়েও বসল না রানা। প্রেসিডেন্টকে খুব চিন্তিত মনে হলো। একভাবে সামনের টেবিলে রাখা একটা টেলিফোন সেটের দিকে চেয়ে আছেন তিনি গালে হাত রেখে।

'কি ব্যাপার?' ফিশারকে প্রশ্ন করল রানা।

'এইমাত্র জিম্বালা থেকে একটা ফোন কল এসেছিল, রানা। খারাপ খবর।'

'কি ঘটেছে?'

'প্রেসিডেন্টের ছোট ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে।'

রামেল নগুয়েনের দিকে ফিরল রানা। 'খুলে বলুন, স্যার। এক মিনিট,' দুই বুলেট ক্যাচারের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা দুজন বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। কথা শেষ করে আমি ডাকব তোমাদের।' রোবটের মত নির্দেশ পালন করল লোক দুটো। 'এবার বলুন।'

'আমার ছোট ভাই সাংবাদিক, মিস্টার রানা। একজন ইনফর্মারের সাথে দেখা করার জন্যে বেরিয়েছিল অফিস থেকে। এই সময় ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। পরে অজ্ঞাতনামা কেউ টেলিফোনে পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে জানায় জা ভুলির অনুগত কিছু লোক তাকে কিডন্যাপ করেছে। আপনি নিশ্চই জা ভুলির নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। নিষিদ্ধ ঘোষিত সিকিউরিটি পুলিস চীফ। লোকটাকে না বন্দী করা হয়েছিল?'

'কারাগার ভেঙে তাকে বের করে নিয়ে গেছে তার অনুগতরা। আমার

সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছে জা ভুলি। সম্ভবত তারই প্রথম ধাক্কাটা গেল তখন। এক সোর্সের মাধ্যমে সংবাদটা জানতে পারে আমার ভাই। ষড়যন্ত্রের নীল নকশাও ওর হাতে পড়েছে। এসবের পিছনে কোন এক বৃহৎ শক্তির ইন্টেলিজেন্স নেটওয়র্ক জড়িত রয়েছে বলে পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে জানিয়েছিল আমার ভাই। অবশ্য দেশটির নাম উল্লেখ করেনি ও।'

'টেলিফোন কে করেছিল?' বলল মাসুদ রানা।

'নিগেল বুলি। লা ভয়েক্স-এর সহকারী সম্পাদক। জামেল ওই পত্রিকার সম্পাদক।'

'এটা কোন্ বৃহৎ শক্তি হতে পারে, অনুমান করতে পারেন?'

'সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়,' দৃঢ় আস্থার সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'সে ব্যাপারে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত। আমার বাবা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন কমিউনিস্টদের এবং জা ভুলি তার যোগ্য অনুসারী। কেজিবি তাকে সাহায্য করতে চাইলেও সে নেবে না।'

অকারণেই মুখের রঙ পাল্টে গেল মাইকেল ফিশারের। তাড়াতাড়ি আরেকটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। চোখাচোখি হলো রানা এবং কলচিনস্কির।

'জা ভুলির যেমন লোকবল, তেমনি আছে অর্থবল। এক্স সিকিউরিটি পুলিস ফোর্সের সবাই সমর্থন করে তাকে। এরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষিত। ফ্রেঞ্চ পুলিসের কাছে ট্রেনিঙ পাওয়া। আর টাকা পায় সে হ্যাবেন এবং কোনডেসির মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির কাছ থেকে। এরা সবাই আমেরিকান ব্যবসায়ী। আমার দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ আর কাঠ চোরাপথে বিদেশে পাঠিয়ে টাকার পাহাড় গড়েছে একেকজন। এ কাজে তাদের এতদিন সহায়তা করে এসেছে আমাদেরই এক শ্রেণীর

দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারী এবং আমলা। তারা জানে আমি ক্ষমতায় থাকলে এ সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হবে না। কারণ এরই মধ্যে আমি এই দুই প্রধান অর্থকরী সম্পদ জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। অ্যাণ্ড ইউ নো, এ ধরনের ভুঁইফোঁড় পয়সাওয়ালারা নিজের পিঠ বাঁচাতে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। জিম্বালায় নতুন করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে তাদেরই লাভ। আবার চার হাত-পায়ে লুটপাট চালাতে পারবে। অতএব করবে না-ই বা কেন? কিন্তু আমি তা সহ্য করতে রাজি নই। আমার ওপর জিম্বালার দুর্ভাগা জনগণের অনেক আশা। তাদের হতাশ করার চেয়ে আমি বরং মৃত্যুকেই বেছে নেব।'

আসন ছাড়লেন রামেল নগুয়েন। তিন জোড়া চোখ অনুসরণ করছে তাঁকে। চিন্তিত মুখে নিজের জন্যে আধ গ্লাস বুরবোঁ ঢাললেন প্রেসিডেন্ট, তারপর লিকার কেবিনেটের সঙ্গে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। 'কেউ জানে না, অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরে যাওয়ার এক বছরের মধ্যে পর পর তিনবার হামলা হয়েছে আমার জীবনের ওপর। প্রতিটি হামলার পিছনে জা ভুলির নোংরা হাত ছিল। প্রমাণ পেয়েছি আমি। কিন্তু কাউকে কিছু জানাইনি। এমনকি বাবাকে পর্যন্ত নয়। কারণ, আমার মনে হয়েছে তিনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। উল্টে আমাকেই সন্দেহ করতে শুরু করবেন। জা ভুলির মত বিশ্বাস আর কাউকে করতেন না আমার বাবা। এমনকি মাকেও নয়। ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পর বছর দুয়েক সবই ঠিকঠাক ছিল।

'এরপর হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। মনে হলো, বাবা আমাকে তাঁর উত্তরসূরী করার ব্যাপারে মত পাল্টে ফেলেছেন। আগে দেশের সব ব্যাপারেই তিনি আমার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতেন, আমার মতামত জানতে চাইতেন। হঠাৎ করেই তা বন্ধ করে দিলেন। রাজনীতি দূরে থাক, নিতান্ত সাধারণ বিষয় নিয়েও কথা বলতেন না তিনি। বুঝলাম

কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়ে গেছে, আমার আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত পড়তে যাচ্ছে। কাজেই নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার কাজে ভেতরে ভেতরে লেগে গেলাম আমি এরপর।'

সামনে স্থাণুর মত বসে থাকা তিনজনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল রামেলের দৃষ্টি। দীর্ঘ চুমুক দিলেন তিনি গ্লাসে। 'আমার বাবা আলফোনসো নগুয়েন একাই ছিলেন জিম্বালার সরকার। তিনি একাই সিদ্ধান্ত নিতেন, একাই তাকে আইনে রূপ দিতেন। মন্ত্রীরা সব ছিল হেঁ হেঁ গোছের, "ইয়েস স্যার" মন্ত্রী। একটা বিষয় আপনারা নিশ্চই লক্ষ করেছেন, যে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র একজনের হাতে থাকে, সব কাজ একজনের মর্জিমাফিক হয়, সে যদি কোন কারণে দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়, তাহলে তার অধস্তনরা মা হারা গো বৎসের মত দিশেহারা হয়ে পড়ে। কি করবে, কি করা প্রয়োজন বুঝতে পারে না। বাবার হার্টফেল করার পর জিম্বালায়ও তাই ঘটেছিল। একমাত্র জা ভুলি ছাড়া মন্ত্রীসভার আর সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

'এই সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি করিনি আমি। খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হয়েছে আমাকে। আগেই বলেছি, বাবার মনোভাব বদলে গেছে টের পেয়ে নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার কাজে হাত দিই আমি। গোপনে সেনাবাহিনী এবং সাধারণ পুলিস বাহিনীর সমর্থন পাওয়ার আশায় অত্যন্ত গোপনে তাদের উঁচু পদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি সে সময়, এবং তারাও সময়মত আমাকে পূর্ণ সমর্থন দেবে বলে আশ্বাস দেয়।'

দুই চুমুকে গ্লাস খালি করে ফেললেন রামেল। আবার এসে বসলেন আগের জায়গায়। 'তাদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করি আমি। সেদিনই দুটো ডিক্রিবলে দেশের সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিই, এবং সিকিউরিটি পুলিস অবলুপ্ত করি।' একটু বিরতি দিলেন প্রেসিডেন্ট। স্মৃতি রোমন্থন করলেন সম্ভবত। 'জা ভুলি ধরা পড়ার পরতাকে ফাঁসীতে

ঝোলাবার পক্ষে প্রচণ্ড গণদাবি উঠেছিল দেশজুড়ে। কিন্তু আমি বাবার পথ অনুসরণ করতে চাইনি। চেয়েছি জিম্বালার বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে তার বিচার করুক। আজ মনে হয় ভুলই করেছি। অন্তত একে শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও আমার স্বৈরাচারী হওয়া উচিত ছিল।'

থামলেন প্রেসিডেন্ট। নীরবতা পাথরের মত চেপে বসল ঘরের ভেতর। সবাই চিন্তিত। একসময় মুখ খুলল মাসুদ রানা। 'প্রয়োজন হলে নিগেল বুলির সাথে যোগাযোগ করা যাবে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট?'

'তা হয়তো যাবে। কথা বলবেন?'

'এখনও ঠিক করিনি,' অন্যমনস্কের মত বলল ও। 'ভেবে দেখি।' সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল। রিসিভার তুলে আটটা নাম্বার টিপল দ্রুত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল একটি মেয়ে কণ্ঠ।

'হ্যালো!'

'রোজি? রানা বলছি। কোন রিপ্লাই এসেছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। বোধ হয় একটু সময় নেবে। তুমি অ্যালার্ট থেকো। এলেই হোটেলে পাঠিয়ে দেবে। আমি লাউঞ্জে রিসিভ করব।' রিসিভার রেখে দিল রানা।

কেউ কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু সবার চোখে জিজ্ঞাসা। শুনতে আগ্রহী।

'লাশ দুটোর সঙ্গে কোন আইডি ছিল না, পরিচয় জানতে পারিনি। তবে আমার সন্দেহ ওরা জিম্বালান নিষিদ্ধ সিকিউরিটি পুলিসের লোক। ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ওদের ছবি এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট ফ্যাক্স করে হ্যাবেন পুলিস হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছি। তার কোন রিপ্লাই এসেছে কি না জানার জন্যে ফোন করলাম,' বলল ও।

'কখন ফ্যাক্স করলে?' বললেন কলচিনস্কি। 'রোজিকে কোথায় পেলে? ওকে না দুপুরেই ছেড়ে দিয়েছিলে?'

'এখানে আসার আগে করেছি ফ্যাক্স। রোজিকে ধরে এনেছি ওর বাসা থেকে।' রোজি ইউনাকোয় রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি। এয়ারপোর্টের উদ্দেশে অফিস ত্যাগ করার আগেই রানার কাছে ছুটি চেয়ে রেখেছিল মেয়েটি দিনের বাকি সময়টুকুর জন্যে। কিন্তু বেচারীর বরাত মন্দ। জরুরী পরিস্থিতির কারণে অফিসে এনে নতুন এক কাজে আটকে রেখে এসেছে তাকে ও।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। হঠাৎ করেই একটা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা মাথায় ঢুকল, কোথায় আছে এখন বেনি পেলেড?

সাত

ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় করে গ্যাঙওয়েের প্রান্তে এসে দাঁড়াল সামসাদ কোরেশি। চোখে গাঢ় সানগ্লাস। কাঁধে মাঝারি একটা ট্রাভেল ব্যাগ। লম্বা পাঁচ ফুট দশ। একহারা গড়ন। খাড়া নাক, থুতনিতে হালকা খাঁজ। ক্লীন শেভড্ মুখের ফর্সা চামড়ার নিচে মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের ক্ষীণ নীলচে আভাস। ফেড জিনস, সাদা ওপেন নেকড্ শার্ট পরে আছে সামসাদ—রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা প্রধান।

সামনে ডিম আকৃতির ভবনটির মাথায় বড় করে সোয়াহিলি ভাষায়

লেখাঃ হ্যাবেন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। একই কথা নিচে ছোট অক্ষরে ফরাসী ও ইংরেজিতেও রয়েছে। এয়ার ফ্রান্সের সুন্দরী এয়ার হোস্টেস মিষ্টি হাসির সঙ্গে মুখস্থ বিদায় সম্ভাষণ জানাল সামসাদকে। আরও আটজন যাত্রী নামল হ্যাবেনে। গ্যাঙওয়ের গোড়ায় অপেক্ষমাণ এয়ার জিম্বালার বাসে চড়ে টার্মিনাল ভবনে পৌঁছল তারা।

নতুন রঙ করা হয়েছে ভবনটি। বাতাসে তারপিনের তাজা গন্ধ। ভেতরে আর্মি গার্ড রয়েছে কয়েক জায়গায়। পাসপোর্ট কন্ট্রোলের খুদে সারিতে দাঁড়িয়ে সেই সঙ্গে টেনশনের গন্ধও পেল সামসাদ কোরেশি। সামনের মহিলা যাত্রীটি লাইন ত্যাগ করতে ইউনিফর্ম পরা অফিসার হাত বাড়াল তার পাসপোর্টের জন্যে। হস্তান্তর করল সে ওটা। সানগ্লাস নামিয়ে হাসল অফিসারের উদ্দেশে।

পাসপোর্টের ভেতরে নজর বোলাল লোকটা। 'আপনার জিম্বালা আগমনের উদ্দেশ্য?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হাসিটা আরেকটু চওড়া হলো সামসাদের। 'আমি সাংবাদিক। আর এ দেশটা বর্তমানে সংবাদের ঝুড়ি। ওর মধ্যে থেকে যতগুলো পাওয়া যায় টপাটপ্ ঝোলায় পুরব বলে এসেছি,' তাকে ট্রাভেল ব্যাগটা দেখাল সে।

গাম্ভীর্যে চিড় ধরল অফিসারের। হাসির আভাস ফুটল মুখে। 'কতদিন থাকবেন, স্যার?'

'এখনই নিশ্চিত বলতে পারছি না। তবে সপ্তাখানেক, সম্ভবত। অবশ্য যদি সরকারী আর বিদ্রোহীদের ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়ে পৈতৃক প্রাণটা তার আগেই না হারাই।'

এবার দাঁত দেখা গেল লোকটির। সীল মেরে পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দশ দিনের জন্যে ভিসা দেয়া হলো। এর বেশি অবস্থান করতে হলে হ্যাবেনে আমাদের ফরেন অফিস থেকে রিনিউ করিয়ে নেবেন দয়া করে।'

'ধন্যবাদ !'

'আপনার জিম্বালা অবস্থান সুখময় হোক, স্যার।' পরের জনের দিকে নজর দিল অফিসার।

ইনফর্মেশন ডেস্কে এল এবার সামসাদ কোরেশি। অ্যাটেনডেন্টকে নিজের পরিচয় জানাতে ড্রয়ার থেকে একটা চকচকে চাবি বের করে ওকে দিল সে। চাবির গায়ে কাঁচা হাতে খোদাই করে '৩০' লেখা। উল্টেপাল্টে দেখল সামসাদ চাবিটা। 'লকাররুম কোথায়?'

হাত তুলে ভবনের উত্তর প্রান্ত নির্দেশ করল অ্যাটেনডেন্ট। সেদিকে চলল কোরেশি। কয়েকসার লকারের ভেতর থেকে খুঁজে বের করল ৩০ নম্বরটি। ভেতরে পাওয়া গেল চামড়ার একটি হ্যাণ্ডব্যাগ এবং একটি খাম। জিপার খুলে ব্যাগের মধ্যে উঁকি দিল সে। একটা বেরেটা, সঙ্গে ভাঁজ করে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে মোড়া বয়েট শোল্ডার হোলস্টার।

জিপার টেনে দিল সামসাদ। ট্রাভেল ব্যাগের সাইড পকেটে ঢোকাল খুদে হ্যাণ্ডব্যাগ। খামটা খুলল। দ্য ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি হোটেলে ওর নামে রুম রিজার্ভ করা হয়েছে, তার একটা ফ্যাক্স কপি এবং ছোট বড়য় মিলিয়ে একতাড়া স্থানীয় মুদ্রা। ওগুলো পকেটে পুরে লকার বন্ধ করল সামসাদ। চাবিটা ডেস্কে ফেরত দিয়ে টার্মিনালের বাইরে এসে দাঁড়াল।

প্রচণ্ড উত্তাপে মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘাম ছুটে গেল তার। কিন্তু নড়ার নাম নেই। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কাউকে আশা করছে যেন। ঝাড়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সামসাদ। কিন্তু এল না কেউ। বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোল ও। একটাই মাত্র ট্যাক্সি আছে, সাদা রঙের টয়োটা।

খবরের কাগজ ভাঁজ করে বসে বসে নিজেকে বাতাস করছিল প্রকাণ্ডদেহী নিগ্রো ড্রাইভার। শরীরের সঙ্গে ঘামে লেপটে আছে শার্ট।

সামসাদকে এগিয়ে আসতে দেখে চট্ করে বেরিয়ে পড়ল সে গাড়ি থেকে। পিছনের দরজা মেলে ধরল। 'কোথায় যাবেন, স্যার?'

'ইন্টারন্যাশনাল হোটেল।'

মুহূর্তের জন্যে ভুরু কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল ড্রাইভারের। 'ওহ্, বুঝেছি। এতদিন ওটা ছিল আলফোনসো নগুয়েন হোটেল। মাত্র কদিন আগে নাম পাল্টানো হয়েছে। তাই হঠাৎ ইন্টারন্যাশনাল নাম শুনে কেমন খট্কা লেগে গিয়েছিল।'

সামসাদ উঠে বসতে দরজা বন্ধ করল লোকটা। উঠে বসল নিজের আসনে। সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে গেল টয়োটা। মনে মনে হাসল সামসাদ। সরে ওপাশের দরজা ঘেঁষে বসল। রওয়ানা হলো ট্যাক্সি এক্সিটওয়ের দিকে। শ'খানেক গজ এগিয়েছে টয়োটা, এই সময় পিছনে আরেকটা গাড়ি স্টার্ট নিল—একটা হাল্কা নীল কর্টিনা। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের উল্টো দিকে, রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করছিল ওটা অনেক আগে থেকেই।

দুজন আরোহী রয়েছে কর্টিনায়। দুজনের পরনেই কালো ওভারল। গাড়ি চালাচ্ছে আলফ্রেড ট্রানবুল। নিষিদ্ধ সিকিউরিটি পুলিসের সার্জেন্ট। জা ভুলিকে লা টামবিয়ের থেকে মুক্ত করে আনার সময় টমাস সিবেলের সঙ্গে ছিল এ লোক। তার পাশেরজন স্বয়ং সিবেলে। মাথায় চামড়ার ক্যাপ, চোখে গাঢ় সানগ্লাস পরেছে তারা। ক্যাপ টেনে মাঝ কপাল পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে, ফলে চেহারা চেনার উপায় নেই কারও। নিরাপদ দূরত্বে থেকে টয়োটাকে অনুসরণ করে চলল কর্টিনা।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা ওয়ালথার পি ফাইভ বের করল টমাস সিবেলে। গুঁজে রাখল ডান উরুর নিচে। এরপর ড্যাশবোর্ডের ওপর রাখা একটা খাম খুলে ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করল। আজই ভোররাতে এটা হাতে পেয়েছে সে, একটা ফ্যাক্স মেসেজ।

ট্যাক্সির আরোহীটির পরিচিতি এবং ছবি আছে ওতে। ছবি খুব একটা স্পষ্ট না হলেও সামসাদ কোরেশিকে চিনে নিতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি সিবেলেকে। লোকটা ওদের শত্রু, পথের কাঁটা। যাকে রামেল নগুয়েনের হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেই মাসুদ রানার সহকর্মী এ লোক। মাসুদ রানার নির্দেশে এদেশে এসেছে লোকটা। একে খতম করতে হবে।

এয়ারপোর্ট এলাকা ছেড়ে কিছুদূর এগোতেই ঘন ঘন রোড ব্লক অতিক্রম করতে শুরু করল ট্যাক্সি। খানিক পর পর রাস্তার পাশে রাখা আছে এক জোড়া করে কাঠের তৈরি লম্বা, চৌকো, কাঁটাতার দিয়ে মোড়া ব্লক, প্রয়োজন পড়লে টেনে নিয়ে এসে পাশাপাশি রেখে দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে রাস্তা। প্রতিজোড়া ব্লকের সঙ্গে ক্যামোফ্লেজড্ ইউনিফর্ম পরা সেনাবাহিনীর ছোট ছোট সশস্ত্র ইউনিট।

রাস্তার দু পাশটা একদম ফাঁকা। যতদূর চোখ যায় ধু-ধু মাঠ। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে ধাঁধাঁ লেগে যায় উত্তাপের অদৃশ্য ধোঁয়ার কারণে। 'এদিকটা ফাঁকা কেন?' কথা বলে উঠল সামসাদ কোরেশি। 'বাড়ি ঘর নেই!'

'এমনিই,' রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে উত্তর দিল ড্রাইভার। 'আমরা খুব গরীব। বাড়ি তৈরি করব কি দিয়ে? তবে টাউনে অনেক বাড়ি আছে, স্যার। পয়সাওয়ালাদের সুন্দর সুন্দর বাড়ি। চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কেবল।'

ট্যাক্সি যতই হ্যাবেন কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে, আর্মির উপস্থিতি ততই বেশি বেশি চোখে পড়ছে। প্রতিটি ইউনিট আগেরটির চাইতে পরেরটি বড়। এছাড়া এম-সিক্সটিন ও এম-ফর্টিওয়ান ট্যাঙ্কও মোড়ে মোড়ে মোতায়েন রয়েছে। এখানেও টেনশনের গন্ধ পেল সামসাদ।

পাশাপাশি একটা বিষয় চিন্তায় ফেলে দিল ওকে। সরকারী সৈন্যদের

বেশিরভাগই অল্পবয়সী। অনেকের দাড়ি-গোঁফের রেখা পর্যন্ত গজায়নি। বয়সে নবীন এবং অনভিজ্ঞ বলে তাদের চোখমুখের অনিশ্চিত ভাব পরিষ্কার বোঝা যায়। আসল সময়ে সুশিক্ষিত এবং ভারি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিদ্রোহীদের সঙ্গে এরা কতদূর এঁটে উঠবে ভেবে শঙ্কা বোধ করল সে।

'আপনি আমেরিকা থেকে এসেছেন, তাই না, স্যার?'

ড্রাইভারের প্রশ্নে সচকিত হলো ও। 'হ্যাঁ।'

'আমাদের প্রেসিডেন্টও আমেরিকা গেছেন।'

'জানি।'

'মানুষটা ভালই। বাপের মত বদ না। ব্যাটা মরে ভূত হয়ে জা ভুলির কাঁধে সওয়ার হয়েছে। আপনি জানেন না জিম্বালার অবস্থা? কেন এ সময় আসার ঝুঁকি নিলেন? বিদ্রোহীদের নিয়ে কোনডেসিতে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে জা ভুলি, যে কোন মুহূর্তে সরকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে বেধে যাবে ক্ষমতা দখলের লড়াই। আপনি বিদেশী। তাড়া খেলে পালাবেন কোথায়?'

উত্তর দিল না সামসাদ কোরেশি। অবশ্য উত্তরের জন্যে বসেও নেই ড্রাইভার। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

এরকম উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেটা স্বাভাবিক, প্রচুর গুজব সৃষ্টি হয়েছে জিম্বালায় এবং বাইরের বিশ্বে। আসার পথে প্লেনে একটি মার্কিন দৈনিকে এমনি এক মুখরোচক গুজব পড়েছে সামসাদ। যার সারমর্ম হচ্ছে, বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করার পর্যাপ্ত লোক এবং অস্ত্রবলের অভাব আছে বলে নিউ ইয়র্কে এক গোপন বৈঠকে রামেল নগুয়েন প্রতিবেশী শাদ, নাইজার এবং সুদানের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের সরকারের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়েছেন।

অন্য এক পত্রিকায় পড়েছে, ক্ষমতা দখলের পর কে কোন মন্ত্রীত্ব নেবে, তাই নিয়ে জা ভুলির অফিসারদের মধ্যে এরই মধ্যে 'কুত্তা কামড়াকামড়ি'

শুরু হয়ে গেছে। কোন এক সিনিয়র অফিসার নাকি এই নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারই ইউনিটের এক জুনিয়র অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেছে। যার পরিণতিতে সিনিয়র অফিসারটিকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে জা ভুলি।

দ্বিতীয়টির কথা জানে না সামসাদ। তবে প্রথমটি যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তা বেশ ভালই জানে। এ ধরনের একটা বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে সবে ভাবনা-চিন্তা করছেন মাসুদ ভাই। এমনকি রামেলকে পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই জানাননি তিনি।

'দি ইন্টারন্যাশনাল,' ঘোষণা করল ড্রাইভার।

বুঝতে পারেনি আনমনা সামসাদ। 'কি?'

'আমরা এসে পড়েছি।'

হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল ট্যাক্সি। বাইরে থেকেই বোঝা যায় হোটেলটা সাধারণ হোটেলের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে বড় জোর দুই তারা হবে। পোর্চে থেমে দাঁড়াল ট্যাক্সি ধীরে ধীরে। হোটেলের ডোরম্যান দ্রুত এসে পিছনের দরজা মেলে ধরল। সামসাদ নেমে পড়তে মাথার ক্যাপ সামান্য উঁচু করল লোকটা সম্মান দেখানোর জন্যে। খামের টাকা আগেই পকেটে রেখেছিল সামসাদ। ওখান থেকে ট্যাক্সি ভাড়া মেটাল।

নোটগুলো দুবার গুণল ড্রাইভার। সমীহ ফুটে উঠল চেহারায়। দাঁত বের করে লম্বা স্যালুট ঠুকল সে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার! থ্যাঙ্ক ইউ!' বলতে বলতে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। মনের আনন্দে অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল হোটেল ছেড়ে।

না বুঝে টাকা বোধহয় বেশিই দেয়া হয়ে গেছে ব্যাটাকে, ভাবল সামসাদ। এ দেশের মুদ্রামান সম্পর্কে জেনে নিতে হবে হোটেল

ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে। ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ডোরম্যানের পাশাপাশি লাউঞ্জের প্রবেশপথের দিকে পা বাড়াল ও। এই সময় পিছনে গর্জে উঠল কর্টিনার এঞ্জিন। আগেই কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়েছিল ওটা।

এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সুযোগের। ট্যাক্সিটা বেরিয়ে যেতে খালি হয়ে গেল জায়গাটা। টার্গেট একদম ফাঁকায় রয়েছে। সাঁ করে এগিয়ে এল আলফ্রেড টানবুল। সামসাদের দশ গজ পিছনে কড়া ব্রেক কষে কর্টিনা দাঁড় করিয়ে ফেলল। ঘুরে তাকাতে যাচ্ছিল ও, আচমকা কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, 'ওয়াচ আউট!' পরমুহূর্তে পিঠে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল।

টাশ্‌শ্‌! টাশ্‌শ্‌!!

পড়েই এক গড়ান দিয়ে একটা চওড়া পিলারের আড়ালে আশ্রয় নিল সামসাদ কোরেশি। দুটো গুলিই পিছনের দেয়ালের কোথাও বিদ্ধ হয়েছে বুঝল ও পিছনে প্লাস্টার খসে পড়ার আওয়াজে। ওদিকে কপালদোষে এমন সহজ একটা টার্গেট মিস হওয়ায় নিজেকে অভিসম্পাত দিল টমাস সিবেলে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। টার্গেট গা ঢাকা দিয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে যে আরেকবার চেষ্টা করবে, তাও সম্ভব নয়।

ধারেকাছের কোন আর্মি টহল গাড়ির কানে যদি পৌঁছে গিয়ে থাকে গুলির শব্দ, তাহলেই বিপদ। ধাওয়া করলে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না। রেগেমেগে টানবুলকে গাড়ি ছোটাবার নির্দেশ দিল সে। তীরবেগে দৌড় লাগাল কর্টিনা।

মাটিতেই শুয়ে পড়েছিল ডোরম্যান আড়াল না পেয়ে। বিপদ পালিয়ে বেঁচেছে বুঝতে পেরে সামসাদকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এল সে। কিন্তু লোকটি পৌঁছার আগেই ভূমিশয্যা ত্যাগ করল কোরোশি। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বড় রাস্তায় উঠে পালাতে ব্যস্ত

কাটনার দিকে।

'আপনি ঠিক আছেন, স্যার?' ব্যস্ত গলায় জানতে চাইল ডোরম্যান। 'কোথাও চোট লাগেনি তো?'

'কিছু হয়নি। ঠিক আছি আমি। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন হলো! এটা কি তোমাদের অভ্যর্থনার রীতি নাকি?'

আমতা আমতা করতে লাগল লোকটি। 'দুঃখিত, স্যার। ওরা কারা ছিল বুঝতে পারছি না। একজন বিদেশীকে কেন শুধু শুধু...।'

ভাবনায় পড়ে গেল সামসাদ। কেন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল লোকগুলো? কারা ওরা? বিদ্রোহী দলের কেউ? কিন্তু তা-ই বা কি করে হবে? ওর জিম্বালা সফরের কথা চারজন মাত্র জানে নিউ ইয়র্কে এবং তাদের কাছ থেকে খবর ফাঁস হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তাহলে? চিন্তার কথা হলেও আপাতত ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চাইল কোরেশি। ঘুরে প্রাণরক্ষাকারীর দিকে তাকাল।

আফ্রিকানদের তুলনায় মানুষটিকে ছোটখাটই বলা চলে। বয়স বোঝার উপায় নেই। তবে ধারণা করল আটাশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। চোখ কুঁচকে লোকটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল সামসাদ। মনে হলো ভাবছে কিছু। তাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হোটেল ম্যানেজার।

ডোরম্যান তাকে সোয়াহিলি ভাষায় উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল কি ঘটেছে। লোকটির বক্তব্য শেষ না হতেই ঘটা করে কোরেশির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল ম্যানেজার। 'আমি দুঃখিত, স্যার। খুবই দুঃখিত। ভেতরে চলুন, এখনই পুলিশ স্টেশনে ফোন করছি আমি। দেখি, কার এতবড় সাহস...'

'থাক। কিছুই হয়নি আমার। অনর্থক পুলিস ডাকার দরকার নেই।'

তবু ডাকতেই হবে, স্যার। দেশে কি আইন-কানুন নেই! দিনে-দুপুরে আমার হোটেলের গেস্টের...মানে, স্যার, পুলিসকে না জানালে পরে অন্য ঝামেলা হতে পারে। বুঝলেন না?'

'বেশ, ডাকুন তাহলে।' চশমাওয়ালার দিকে ফিরল ও। 'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে...'

'ওসব লৌকিকতার কোন প্রয়োজন নেই,' আড়চোখে ডোরম্যান এবং ম্যানেজারের দিকে তাকাল লোকটা। 'আপনার সাথে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।'

'কি কথা?'

'এখানে বলা ঠিক হবে না। আপনার রুমে চলুন।'

কথা বাড়াল না আর সামসাদ কোরেশি। অন্য দুজন বলতে গেলে প্রায় হাঁ করে ওদের দেখছে। 'চলুন।'

খাতাপত্রের সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা সেরে পোর্টারের পিছন পিছন লিফটের দিকে পা বাড়াল ওরা। চারতলায় করিডরের দক্ষিণ প্রান্তে সামসাদের দুই রুমের খুদে স্যুইট। পিছনে ছোট ঝুল বারান্দা। সীটিংরুমটা মোটামুটি বড়। সাজগোজ সুন্দর। জানালা দিয়ে বড় রাস্তা দেখা যায়। পোর্টারকে বখসিস দিয়ে বিদেয় করল সামসাদ। তারপর মুখোমুখি হলো মানুষটির। 'বলুন এবার।' লিফটে ওঠার সময় ব্যাগের পকেট থেকে আলগোছে পিস্তলটা বের করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়েছিল ও। ডান হাতে ওটার বাঁট ধরে আছে মুঠো করে। বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

'আমার নাম নিগেল বুলি। লা ভয়েক্স-এর সহকারী সম্পাদক।'

মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না সামসাদের। 'চিনলাম না।'

মৃদু হাসল লোকটা। 'ওই লোকটিকে চিনি আমি, যে হত্যা করতে চেয়েছিল আপনাকে।'

সামসাদ নিরুত্তর।

'লোকটার নাম টমাস সিবেলে। নিষিদ্ধ সিকিউরিটি পুলিসের ডেপুটি চীফ ছিল।' জানালার কাছে গিয়ে নিবিষ্টমনে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকল লোকটি কয়েক মুহূর্ত। মুখ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যায় গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'হ্যাবেন সরকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এখানে পথে বের হয়ে নিজের জীবনের ওপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে সিবেলে। কারণ ওটার চাইতে আপনাকে হত্যা করাই এ মুহূর্তে জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে ওদের কাছে। আমার সন্দেহ, যে করেই হোক আপনার জিম্বালা আগমনের ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে গেছে।'

মনে মনে নিগেল বুলির মন্তব্য অনুমোদন করল কোরেশি, কিন্তু কিছু বলল না এবারও।

কিছুক্ষণ ওর মুখ খোলার অপেক্ষায় থাকল বুলি। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ নেই দেখে বলল, 'নিজেকে গোপন রাখতে চাইছেন আপনি। তার আসলে কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি আপনি কে। তেমনি আপনিও নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন আমি কে। দুর্ভাগ্য, এয়ারপোর্টে আপনাকে রিসিভ করতে ঠিকই গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু টমাস সিবেলের জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে দেখেও এগোতে সাহস পাইনি। ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। কোন্ মতলবে লোকটা এয়ারপোর্ট গেছে জানার জন্যে আড়ালে ছিলাম। ও আপনার পিছু লেগেছে দেখে আমিও ওর পিছনে লাগি। সারাপথ পিছনেই ছিলাম, শহরে ঢুকে আপনাদের ওভারটেক করে এখানে এসে অপেক্ষা করতে থাকি। এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে। এয়ারপোর্টে যদি মিলিত হতাম আমরা, তাহলে এতক্ষণে দুজনেরই লাশ পড়ে থাকত হয়তো হোটেলের বাইরে।'

এবার মুখ খোলা যায়, ভাবল সামসাদ। এতক্ষণ খোলেনি, কারণ মনে

সন্দেহ ছিল, ওর এদেশে আগমনের ব্যাপারটি যদি সত্যিই ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ নকল নিগেল বুলিও হতে পারত।

হ্যাবেনের দক্ষিণ প্রান্তের একটি নিঃসঙ্গ একতলা ভবন। বর্তমানে বিদ্রোহী বাহিনীর সেফহাউস। ওটার গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল আলফ্রেড টানবুল। স্টার্ট বন্ধ করার আগেই নেমে পড়ল টমাস সিবেলে, আছড়ে বন্ধ করল দরজা। কেঁপে উঠল কর্টিনা। বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে বারান্দায় উঠে গেল সে। তালায় চাবি ঢুকিয়ে জোরে মোচড় দিল। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পরক্ষণেই আবার দড়াম। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্টার্ট বন্ধ করল টানবুল। হ্যাণ্ড ব্রেক টেনে দিয়ে বেরিয়ে এল। পায়ে পায়ে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। ড্রইংরুমে থমথমে মুখে বসে আছে সিবেলে। কপালে গভীর কুঞ্চন।

টানবুলের পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল চোখেমুখে। মুখ ঘুরিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখা টেলিফোনটা নিজের কোলে টেনে নিল সে।

'আপনাকে কোন ড্রিঙ্ক দেব?' নরম গলায় প্রশ্ন করল টানবুল। টমাস সিবেলের ব্যর্থতার কষ্ট অনুভব করতে পারছে সে খানিকটা।

দ্রুত নেতিবাচক মাথা ঝাঁকাল সে। টেলিফোনের ওপর নজর রেখে যেন ওটাকেই প্রশ্ন করল, 'কি বলব এখন তাঁকে?'

'যা ঘটেছে তাই,' লিকার কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল টানবুল। আধ গ্লাস স্কচ ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল গ্লাসে।

'তাঁকে জানাব ব্যর্থ হয়েছি আমি?' চোখ বড় বড় করে তার দিকে চেয়ে থাকল সিবেলে।

'হ্যাঁ। কারণ যা ঘটে গেল সে জন্যে আপনি দায়ী নন। ওরকম কিছু ঘটবে বলে প্রস্তুত ছিলেন না আপনি।'

'কথাটা নিজমুখে বলতে পারবে তুমি চীফকে?'

'উঁহুঁ! কাজটা আমার নয়, আপনার।'

কয়েক মুহূর্ত নিজেকে প্রস্তুত হওয়ার সময় দিল সিবেলে। তারপর পরিচিত নাম্বারটা ঘোরাল। একটা রিঙ হতেই ও মাথায় সাড়া দিল জা ভুলি। কাঁপা গলায়, সংক্ষেপে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাল সে তাকে।

'এখনও তাহলে বেঁচে আছে লোকটা?' কঠিন গলার প্রশ্ন জা ভুলির।

'জ্বী।'

'বীর পুঙ্গবটি কে যে রক্ষা করল তাকে?' বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছে জা ভুলি।

'দেখার সময় পাইনি, স্যার। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে...'

'তুমি আমাকে পুরোপুরি হতাশ করলে, সিবেলে। এতদিন ভাবতাম এসব সাধারণ কাজে তোমার কোন জুড়ি নেই।'

'স্যার, এরকম আকস্মিক বাধা আসতে পারে ভুলেও ভাবিনি।'

'আমি কাজ চাই, সিবেলে। ব্যর্থতা নয়। তোমার দ্বারা কাজটা যদি সম্ভব না হয় বলে দাও, আমি অন্য লোক দেখছি। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'কাবাবের এই হাড্ডিটির পরিচয় খুঁজে বের করে জানাও আমাকে।'

'আপনি চাইছেন তাকেও শেষ করে দিই?' আলগোছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল টমাস সিবেলে।

'যদি একে অতিরিক্ত প্রত্যাশা মনে না করো।'

'বেশ, তাই হবে।'

'প্রার্থনা করি সফল হও। আমাকে যদি এ কাজে আর কাউকে নিয়োগ করতে হয়, তাহলে আমার সরকারের সিকিউরিটি পুলিস চীফের পদটি জুটবে না তোমার ভাগ্যে। মনে রেখো।'

'আমি বুঝতে...' থেমে গেল সিবেলে ডায়াল টোন শুনতে পেয়ে। আলতো করে রেখে দিল রিসিভার। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করতে হবে, অতএব এবার খানিকটা পানীয় গেলা যেতে পারে। উঠে লিকার কেবিনেটের দিকে পা বাড়াল সে। মনটা খুশি হয়ে উঠল। অল্পের ওপর দিয়ে গেছে, ভাবছে টমাস সিবেলে। ওর আশঙ্কা ছিল ব্যর্থতার খবর শুনে স্বভাব অনুযায়ী রেগে চেঁচিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধাবেন জা ভুলি।

যাক, ফাঁড়া কেটে গেছে ভালয় ভালয়। এবার নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে তাকে, দায়িত্বটা যে করে হোক, পালন করতেই হবে। নিজেকে চোখ রাঙাল সে, এবার কোনমতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। যত অপ্রত্যাশিত বাধাই আসুক, সফল তাকে হতে হবে। তার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে। ওর ব্যর্থতার কথা নিউ ইয়র্কে ফোন করে ফ্যালকনকে জানাতে হবে। যাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে সে, তার হ্যাবেন রওয়ানা হওয়ার কথা এই ফ্যালকনই জানিয়েছিল তাকে। কাজেই ব্যাপারটা ফ্যালকনের নলেজে দেয়া দরকার।

আট

কোনডেসি। ব্র্যাঙ্কো কারা প্রধানের অফিসরূমে বসে আছে জা ভুলি এবং এক যুবক। প্রায় ছয় ফুট লম্বা সে, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। ক্রু-কাট্ চুল, হালকা খয়েরি রঙের চোখ। নাকের নিচে সুন্দর করে ছাঁটা একফালি

গোঁফ। ডান চোখের পাশ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত সরু একটা কাটা দাগ রয়েছে যুবকের। দেখতে বেশ সুদর্শন সে। তার ওপর দামী বেশভূষায় মানিয়েছে দারুণ।

যুবকের কোনও কথায় বিস্মিত হয়েছে জা ভুলি। 'বলেন কি! টাকা? কিন্তু এত টাকা কোথায় পাই এখন, বলুন তো! তাছাড়া আপনাকে টাকা পে করার ব্যাপারে ফ্যালকনও কিছু...'

'সে কথা তুলে লাভ নেই, মিস্টার ভুলি। তাছাড়া ওদের সাথে আমি আর থাকছি না।'

'থাকছেন না মানে!'

'থাকছি না মানে থাকছি না। হাতের কাজটা শেষ করে নিজের পথ দেখব আমি। ওদের হয়ে কাজ করার ইচ্ছে নেই আর। তাই টাকা দরকার আমার।'

'কিন্তু মিস্টার পেলেড, এ দেশে আমিই ফ্যালকনের প্রতিনিধি। এত বছর ধরে ফ্যালকনের সেবা করছি আমি। তারই পুরস্কার হিসেবে কাজটা তিনি বিনে পয়সায় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। জিম্বালার প্রেসিডেন্ট যদি আমি হই, তাতে কেবল আমিই লাভবান হবো না, তিনিও হবেন। তাই...আমি ভাবছি...।'

হাসল বেনি পেলেড। 'আপনার কাছে কোন্‌টা বড়, জিম্বালার প্রেসিডেন্ট হওয়া, নাকি এই সামান্য টাকাটা?'

'সামান্য টাকা? একে আপনি সামান্য বলছেন?'

'ভুল বলেছি। বলা উচিত ছিল যৎসামান্য। একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার তুলনায় অঙ্কটা আসলেই তাই। কিন্তু আমার জন্যে ওটা অনেক। আর কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে। এখন বলুন দেবেন কি না টাকা। নইলে আপনি আপনার পথ দেখুন,

আমি আমার পথ দেখি। আর একটা কথা, শুধু টাকা দিলেই চলবে না। কথা দিতে হবে, রামেল নগুয়েনের মৃত্যু সংবাদ না শোনা পর্যন্ত এ কথা এমনকি ফ্যালকনকে পর্যন্ত বলা চলবে না। পরে বলতে পারবেন, আমি নিষেধ করব না।'

চুপ করে থাকল জা ভুলি। আপনমনে ডান হাতের মধ্যমা আর বুড়ো আঙুল দিয়ে ছাগলা দাড়ি খুঁটছে। চেয়ে আছে বেনি পেলেডের দিকে, কিন্তু দেখছে না তাকে।

'আমি কি ধরে নেব আপনি রাজি নন আমার প্রস্তাবে?'

হাত নামাল ভুলি। 'ব্যাপারটা ব্ল্যাকমেইলের মত হয়ে যাচ্ছে না? শেষ মুহূর্তে আমার ওপর এরকম চাপ সৃষ্টি করাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'বুঝলাম,' উঠে দাঁড়াল বেনি পেলেড। 'চলি, রামেল নগুয়েনকে হত্যার জন্যে আর কাউকে খুঁজে নিতে হবে আপনাকে। ফ্যালকনকেই বলে দেখুন না হয়। কিছু একটা ব্যবস্থা সে নিশ্চই করবে আপনার জন্যে।'

'বসুন বসুন, যাবেন না, প্লীজ!' ভাবনা চিন্তার জন্যে নিজেকে আরও কয়েক মুহূর্ত সময় দিল জা ভুলি। 'না হয় টাকা দিলাম। কিন্তু আমার কাজটা যে আপনি করবেন, তার নিশ্চয়তা কি? আপনার কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ফ্যালকনের নিয়ন্ত্রণে থাকতে আর রাজি নন আপনি।'

বাঁকা হাসি ফুটল বেনি পেলেডের ঠোঁটে। 'কোন নিশ্চয়তা নেই, মিস্টার ভুলি। তবে যদি আমার অতীত কার্যকলাপের রেকর্ডে কষ্ট স্বীকার করে চোখ বোলান, দেখতে পাবেন, এ ধরনের কাজে কখনও ব্যর্থ হইনি আমি এবং কাজ নিয়ে তা অসমাপ্তও রাখিনি কখনও। রামেল নগুয়েনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। সবচে' বড় কথা, এসব কাজে প্রচুর আনন্দ পাই আমি। সে যাই হোক, এ মুহূর্তে আমার মুখের কথা বিশ্বাস করা ছাড়া

উপায় নেই আপনার, মিস্টার জা ভুলি।'

আবার নীরবতা। অনেকক্ষণ পর সশব্দে দম ছাড়ল জা ভুলি। 'বেশ। দেব টাকা।' ভেবে দেখেছে সে, মানুষটিকে না চটিয়ে টাকা দিয়ে দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া, পেলেড যদি কাজটা না-ই করে, তাতে তার নতুন করে হারাবারও কিছু নেই। প্রাণটাই তো সেদিন যেতে বসেছিল পাবলিকের আড়ং প্যাঁদানিতে। এই যে তারপরেও বেঁচে আছে সে, এর মূল্যই বা কম কিসে! টাকার তার অভাব নেই, লোকবলের ব্যাপারেও সেই একই কথা। এবং তার অনুগতরা কেউ রামেলের সৈন্যদের মত আনাড়ী নয়, পাশ্চাত্যের ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ একেকজন যোদ্ধা। কাজটা যদি বেনি পেলেড না-ও করে বা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, জা ভুলি নিজেই সময় সুযোগ বুঝে মাঠে নামবে। নিজেই ব্যবস্থা করবে রামেল নগুয়েনের। তবে তার প্রয়োজন পড়বে বলে মনে করে না জা ভুলি। নিউ ইয়র্কে বেনিকে ফ্যালকনের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হবে। এবং সে ভাল করেই চেনে ফ্যালকনকে। এটাও বোঝে, তার কাজ করে না দিলে ফল কি হবে। পৃথিবীর কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না বেনি পেলেড ফ্যালকনের হাত থেকে। বেনি হ্যাবেন ত্যাগ করামাত্র টাকা দেয়ার ব্যাপারটা জানাতে হবে ফ্যালকনকে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল জা ভুলি।

'গুড! বুদ্ধিমানের মত কথা। তবে সময় নেই। আজ রাতেই হ্যাবেন ত্যাগ করছি আমি।' অমায়িক হাসি ফুটল বেনি পেলেডের মুখে। 'নিজেকে জিম্বালার প্রেসিডেন্ট ধরে নিতে পারেন আপনি, মিস্টার জা ভুলি।' মনে মনে বলল, হারামজাদাকে বিশ্বাস নেই। টাকা দেবে ঠিক-ই, এবং তারপর ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কানে দেবে ফ্যালকনের। তা দিকগে। পরোয়া করে না বেনি পেলেড। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ব্রিফকেসটিতে একটি পেটমোটা ম্যানিলা খাম আছে। ওতে ফ্যালকনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর থেকে এ

পর্যন্ত যত কাজ করানো হয়েছে তাকে দিয়ে, প্রতিটির পূর্ণ বিবরণ আছে। দীর্ঘ দিন ধরে নিজের হাতে একটু একটু করে লেখা। যা ফাঁস হলে চমকে উঠবে বিশ্ব, আত্মহত্যা করতে হবে ফ্যালকনকে। ফিরে গিয়েই খামটা তার আইনজীবীর হাতে তুলে দেবে পেলেড, বিশেষ এক নির্দেশসহ।

বেনি পেলেড বুদ্ধি রাখে। জানে এরপর আর তাকে প্রয়োজন হবে না ফ্যালকনের। হলেও কাজে লাগাবে না সে তাকে। ঝুঁকি আছে এতে সাঙ্ঘাতিকরকম। বরং মাসুদ রানা দ্বিতীয়বার পেলেডের নাগাল পাওয়ার আগেই ওর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ নেবে সে। নেবেই। কোন ভুল নেই তাতে। অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

কাজেই নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যে তৈরি থাকতে হবে পেলেডকে। মন থেকে ফ্যালকনের চিন্তা দূর হতেই সেখানে জেঁকে বসল মাসুদ রানা। হাসি পেল তার। মানুষটা বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে নিজেও কম বিপজ্জনক নয়। রানাকে ঠেকিয়ে দেয়ার মোক্ষম ওষুধ হাতে রয়েছে পেলেডের।

ওয়াশিংটন। জর্জটাউন শহরতলীতে পাঁচ বিঘা জমির ওপর সিআইএ ডেপুটি চীফ মার্ক গর্ডনের সরকারী বাসভবন। চারদিকের আট ফুট উঁচু সীমানা দেয়ালের ওপর আরও তিন ফুট ঘন কাঁটাতারের বেষ্টনী। গেটে দুজন সশস্ত্র গার্ড রয়েছে সর্বক্ষণ। ভেতরটা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয় চারজন ডগ হ্যাণ্ডলার।

দোতলা ভবনটির অসংখ্য কামরার প্রতিটিতে বসানো আছে একটি করে ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা। বেসমেন্টের এক কামরায় প্রতি মুহূর্ত কয়েকটি টিভি সেটের সাহায্যে মনিটর করা হয় ওগুলো। কেবল একটি কক্ষে ক্যামেরা নেই, সেটি মার্ক গর্ডনের স্টাডি। বুলেটপ্রুফ

মার্সিডিজ ফাইভ হাণ্ড্রেড এসএল-এ দুজন দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করে সে। একেকদিন একেক পথে অফিসে যাতায়াত করে। মার্ক গর্ডনের স্ত্রী এবং দুই মেয়েকেও দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করতে হয়।

তার স্টাডিরুমটা দোতলায়, করিডরের শেষ মাথায়। সাউণ্ডপ্রুফ। জানালা নেই। একটি চকচকে ধাতব স্লাইডিং ডোর দিয়ে ভেতরে আসা-যাওয়া করে সে। শুধুই সে। এ বাড়ির আর কারও প্রবেশাধিকার নেই ও ঘরে। এমনকি তার স্ত্রীরও না। মার্ক গর্ডনের পার্সোন্যাল কম্পিউটর আছে ওখানে, যার সঙ্গে যোগাযোগ আছে পেন্টাগন এবং ল্যাঙলির সিআইএ হেড অফিসের মেইন কম্পিউটরের।

মার্ক গর্ডন সিআইএ উপ-প্রধান হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর থেকে সংস্থা যত প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তার প্রতিটি ধারণ করা আছে ওতে। শতাধিক 'অ্যাবাভ টপ্ সিক্রেট' প্রকল্প। ছোটখাট প্রকল্প অগণিত। যে কারণে স্টাডির নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর এবং জটিল।

ধাতব দরজাটির পাশে দেয়ালের গায়ে বসানো আছে ডাক বাক্সের ফোকরের মত একটি 'বেল পুশ'। ওর মধ্যে নির্দিষ্ট কোড পাঞ্চ করলেই সক্রিয় হবে স্লাইডিং সিস্টেম। এই কোড কম্বিনেশন আবার প্রতিদিন বদল করে মার্ক গর্ডন। পার্সোন্যাল কম্পিউটর চালু করতে হয় একটি বিশেষ 'অ্যাকসেস কোড'-এর সাহায্যে। স্বভাবতই, এই কোডও জানে একমাত্র মার্ক গর্ডন। কোড না জেনে কেউ কম্পিউটরটি চালু করার চেষ্টা করলে ফলাফল হবে দ্বিতীয়বার দম নেয়ার সময় পাওয়ার আগেই মৃত্যু।

সিলিঙের কয়েক জায়গায় লুকানো আছে লেথাল নার্ভ গ্যাস ক্যানিস্টার। 'অ্যাকসেস কোড' ট্যাপ করার সময় একটি অক্ষর বা সংখ্যাও যদি উল্টোপাল্টা হয়ে যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেটের গ্যাস রুমের ভেতর উগরে দেবে ক্যানিস্টারগুলো। চিন্তা-ভাবনা করে সম্প্রতি তাই এ ব্যাপারে

খানিকটা বাড়তি সতর্কতার আয়োজন করেছে মার্ক গর্ডন। করেছে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেই। ভুল ভুলই। সে-ও করে বসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই ভুল শোধরাবার ব্যবস্থাও রেখেছে। তারপরও যদি হয়েই যায়, পর পর দুবার ভুল 'অ্যাকসেস কোড' চাপা হলে সক্রিয় হবে ক্যানিস্টার।

লম্বা একটা হাই তুলল মার্ক গর্ডন। রাত একটা। সতেরো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নিতে পারেনি সে। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তার এসব নিয়মিত অনিয়মের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে স্ত্রী এবং দুই মেয়ে। তারা জানে, যে মানুষটি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সিআইএ-র চীফ হতে যাচ্ছে, তার ব্যস্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। এ-ও জানে, ক্যাপিটল হিলের প্রায় সকল কংগ্রেসম্যান, এবং এমনকি প্রেসিডেন্টের পর্যন্ত জোরালো সমর্থন রয়েছে তার পিছনে।

কিন্তু তারা এটা জানে না, মার্ক গর্ডনের সোনালী ভবিষ্যৎ বর্তমানে কী সাংঘাতিক বিপন্ন। তীক্ষ্নধার ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাকে প্রতিটি মুহূর্ত। সামান্যতম এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই ঘটে যাবে চরম সর্বনাশ। সে ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ থাকবে না তার। সিআইএ-র বহিরাবরণের ভেতর অত্যন্ত গোপনে, সুকৌশলে নিজস্ব একটা নেটওঅর্ক গড়ে তুলেছিল সে দীর্ঘ দিনের সাধনায়। যে নেটওঅর্ক তাকে দিয়েছে কোটি কোটি ডলার। সুখেই ছিল মার্ক গর্ডন। কিন্তু তা বুঝি আর থাকে না।

যেভাবে আদাজল খেয়ে পিছনে লেগেছে মাসুদ রানা, তাতে বেনি পেলেডের কভার বুঝি আর চেপে রাখা গেল না। সেবার বহু কষ্টে বাঁচানো গেছে লোকটাকে। কিন্তু আর তা সম্ভব হবে না। পেলেডকে যদি এবার ধরতে পারে মাসুদ রানা, তাহলেই সব শেষ। পেলেডের সঙ্গে সবসময় একটা মোটা খাম থাকে। ওতে কি আছে জানে সে। প্রথম সুযোগেই ওটা

সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল মার্ক গর্ডন। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। কম্পিউটর কী-বোর্ডে দ্রুতহাতে সংখ্যা এবং অক্ষর মিলিয়ে তৈরি সর্বশেষ কোডটি ট্যাপ করল।

আগের লেখা মুছে গেল, মুহূর্তখানেক বিরতি দিয়ে ভেসে উঠল কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি। একটি ডোশিয়ে। প্রথমেই বড় অক্ষরে লেখাঃ বেনি পেলেড। অলস চোখে শেষবারের মত ফাইলটা পড়ল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। মাসুদ রানার সহকর্মী লোকটি...নাহ্!

নামটা ছাড়া পুরো ফাইল ইরেজ করে ফেলল গর্ডন মেমরি ব্যাঙ্ক থেকে। তারপর ওর নিচে বড় হাতের অক্ষরে দু লাইনে লিখলঃ 'টু বি টারমিনেটেড আফটার অ্যাসাসিনেশন অভ রামেল নগুয়েন'।

চেয়ারটা পিছিয়ে এনে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল মার্ক গর্ডন। গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকল পর্দার দিকে। কি ভাবে কি করবে, ভাবছে। বুদ্ধিটা হঠাৎ করেই খেলে গেল মাথায়। এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

দিনের শেষ সিগারেটটি অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে আজ সারাদিন। ভোর ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ছায়ার মত রামেল নগুয়েনের সঙ্গে লেগে থাকতে হয়েছে। তারপর দু ঘণ্টা কেটেছে জেনির মান ভাঙাতে আর তার সঙ্গে গল্প করে। গতকাল নানান ঝামেলায় মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা আর মনেই পড়েনি।

আজও সুযোগ করে উঠতে পারেনি ব্যস্ততার জন্যে। তাই আর টেলিফোন করেনি রানা। জানে ওতে কাজ হবে না। রামেল নগুয়েনকে হোটেলে তুলে দিয়েই ছুটে গেছে মাইকেল ফিশারের বাসায়। ওখানে রাতের খাওয়া সারতে বাধ্য হয়েছে রানা। তারপর বসতে হয়েছে পিয়ানোর পাশে। কারও সাহায্য ছাড়াই মোজার্টের একটি সুর তুলেছে জেনি স্বরলিপি

দেখে। রানাকে বাজিয়ে শুনিয়েছে।

রামেল নগুয়েনের কথা ভাবল রানা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে চমৎকার ভাষণ দিয়েছেন আজ তিনি। এই ভাষণেই উপস্থিত প্রায় সবার মন জয় করে নিয়েছেন অবলীলায়। এর অবশ্য অন্য কারণও আছে। ১৯৫৬ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায় জিম্বালা, বর্তমান প্রেসিডেন্টের তখন জন্মও হয়নি।

সদ্য গঠিত জিম্বালার নিরাপত্তা পুলিস বাহিনী নির্বিচারে ওদেশে গণহত্যা চালাচ্ছে, প্রতিবেশী সুদানের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ তার এক পর্যবেক্ষণ দল পাঠাতে চেয়েছিল জিম্বালায়, বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্যে। কিন্তু আলফোনসো নগুয়েন প্রত্যাখ্যান করেন তা। সে দেশেরই নতুন প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র বাস্তবায়নের, খুশি হওয়ারই কথা।

তবে একটা ব্যাপার অবাক করেছে রানাকে। দীর্ঘ ভাষণের সময় একবারও পিতার নাম উচ্চারণ করেননি রামেল বা তাঁর আমলে সংঘটিত হাজারো অন্যায়-অবিচার, অসংখ্য নিরীহ জিম্বালানকে হত্যা ইত্যাদির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনুশোচনাও প্রকাশ করেননি তিনি। পরে রানার মনে হয়েছে, রামেল হয়তো অতীত ভুলে যেতে চান পুরোপুরি। নোংরা, জঘন্য অতীত নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে চান।

আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল মাসুদ রানা। রাত একটা। ঘুমানো দরকার।

নয়

'প্রেসিডেন্ট রামেল যখন অক্সফোর্ডে, তখন একদিন তাঁকে জোর করে রাগবি খেলা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনি। কোন কোন দলের খেলা ছিল সেটা?'

কপাল কুঁচকে উঠল নিগেল বুলির। চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'জীবনেও রাগবি খেলা দেখিনি আমি। রামেল নিজেও দেখেছেন কি না সন্দেহ। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম ফুটবল খেলা দেখতে। স্থানীয় দল ছিল আরসেনাল। ওদের বিরুদ্ধে খেলেছিল...,' চিন্তায় পড়ে গেল লোকটি। চশমা পরে নিয়ে তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে লাগল মাথায়। '...কালো-সাদা স্ট্রাইপড্ জার্সি ছিল দলটির। লণ্ডনের নয়...ওরা ছিল...' তুড়ি বাজাল সে। 'নিউক্যাসল।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সামসাদ। সঠিক জবাবই দিয়েছে নিগেল বুলি। 'খুশি হলাম।'

'আমার মত নয় নিশ্চয়। কিন্তু রাগবির কথা বললেন কেন আপনি? ও, অতিরিক্ত সতর্কতা?'

'ঠিক ধরেছেন। বসুন।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি বলছেন আমার জিম্বালা আসার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে?'

প্রশ্ন করল কোরেশি।

'এ ছাড়া সিবেলের পিস্তলবাজির আর কি যুক্তি থাকতে পারে?'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? অত্যন্ত গোপনে মাত্র আধঘন্টার নোটিসে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করেছি আমি।' ভাবতে লাগল ও, ইউনাকোয় রানার অফিস রুমে বসে চীফ, ডেপুটি চীফের সঙ্গে আলোচনার পর সামসাদকে হ্যাবেন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। আর কেউ সেখানে ছিল না ওরা চারজন ছাড়া। এবং এর আধঘন্টার মধ্যে এয়ারপোর্ট রওয়ানা হয় সে। অবশ্য তার আগে প্রেসিডেন্ট রামেলকেও জানিয়েছে ও ব্যাপারটা। তাহলে?

'আমার বিশ্বাস যে ভাবেই হোক জানতে পেরেছে ওরা।'

'এই লোকই কিডন্যাপ করেছে প্রেসিডেন্টের ভাইকে?'

'হয় সিবেলে, নয় তার অনুসারীরা। টেলিফোনে আমাকে কেবল তাকে কিডন্যাপ করার কথা জানানো হয়েছে।' একটু থামল নিগেল বুলি। 'প্রেসিডেন্ট রামেল এবং জামেল, দুজনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওদের জন্যে।'

'নিখোঁজ হওয়ার আগে জামেলের হাতে যে গোপন রিপোর্টটি পড়ে, সে ব্যাপারে কতটা জানেন আপনি। কি ছিল ওতে বলেছে সে?'

'হ্যাঁ। ওতে রামেল নগুয়েনকে নিউ ইয়র্কে হত্যা করার বিস্তারিত প্লট ছিল। কোথায় কখন হত্যাকাণ্ড ঘটানো হবে সব আছে ওই রিপোর্টে।'

লোকটিকে ভাবতে দেখে প্রশ্ন করল সামসাদ, 'আর কিছু?'

'এক্স সিকিউরিটি চীফ জা ভুলি, টমাস সিবেলেসহ আরও ছয়জনের কথা উল্লেখ আছে। এর মধ্যে দুজন বিদেশী। এদেরই একজন হত্যা করবে প্রেসিডেন্টকে।'

বিস্মিত হলো সামসাদ। 'সে কি! সেদিন যে তাহলে দুজন জিম্বালান

হত্যার চেষ্টা করেছিল তাকে?'

'ওখানেই তো পড়েছি মুশকিলে। জামেল যদি আমাকে অন্তত জানাতে পুরোটা...।'

'আপনি জানতে চেয়েছিলেন?'

'চেয়েছিলাম। কিন্তু ও বলল, পুরো ব্যাপারটা কতখানি সত্যি সে বিষয়ে ভাল করে নিশ্চিত না হয়ে বলা উচিত হবে না। অবশ্য সন্ধের পর ইনফর্মারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে বলেছিল, ওই ব্যাপারেই নাকি আরও তথ্য জোগাড় করতে যাচ্ছে। সফল হলে ফিরে এসে বিস্তারিত জানাবে আমাকে এবং সেদিনই ছাপা হবে তা পত্রিকায়। কিন্তু তা আর হলো কই।'

'ইনফর্মারটি কে ছিল, তা-ও বলেনি জামেল?'

'না, বলেনি। তবে লোকটিকে ট্রেস করতে পেরেছে পুলিস, সম্ভবত।'

'কি ভাবে?'

'যেখান থেকে পুলিস জামেল নগুয়েনের পরিত্যক্ত গাড়িটা উদ্ধার করেছে, সেখানেই আরেকটা গাড়িতে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সূত্র ধরে ওটার মালিককে তারা সনাক্ত করতে পেরেছে।'

'কে সে?'

'জা ভুলির প্রাইভেট সেক্রেটারি টমাস নগুনি।

'তাই নাকি?' অবাক হলো সামসাদ। 'এই লোকই ইনফর্মার?'

'হতে পারে। নাও হতে পারে। হয়তো নগুনির গাড়িটা কোন উপায়ে জোগাড় করে ব্যবহার করেছে কেবল লোকটা। অথবা হয়তো সে-ই ছিল ইনফর্মার। তথ্য পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, খুন হয়ে গেছে সিবেলের হাতে।'

'হুঁম্!' ব্যাপারটা নিয়ে দু মিনিট মাথা ঘামাল ও। 'জামেলকে কোথায় আটকে রেখে থাকতে পারে ওরা অনুমান করতে পারেন?'

'খুব সম্ভব কোনডেসির ব্র্যাঙ্কো কারাগারে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কারণ কোনডেসি বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি। ওর ধারেকাছেও ঘেঁষা যাবে না।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। জামেলকে জিম্মি করার কারণ কি? তার বিনিময়ে বিদ্রোহীরা কি সুবিধে আদায় করতে চাইছে রামেল নগুয়েনের কাছ থেকে? কোন দাবি জানিয়েছে?'

'না। সে ধরনের কিছু হয়তো ওরা চিন্তাও করেনি। আমার মনে হয়, সিবেলে ওকে ধরেছে আসলে খবরটা যাতে পত্রিকায় না যায়, সেটা নিশ্চিত করার জন্যে।'

'জটিল পরিস্থিতি,' আনমনে বলল কোরেশি।

'হ্যাঁ। এবং ভয়াবহ। কোনডেসিতে বিদ্রোহী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখানে সরকারী বাহিনী ওদের অপেক্ষায় আছে। তবে ওরা মুভ না করা পর্যন্ত এরা কোন পদক্ষেপ নেবে বলে মনে হয় না। কারণ খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে সরকারী বাহিনী। বিদ্রোহীদের মধ্যে তাদের অনেকেরই আত্মীয়-বন্ধু আছে। লড়াই শুরু হলে কি ঘটবে বুঝতেই পারছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু সিবেলের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার কিছুতেই।'

'কাল সন্ধের পর প্রথম দেখা গেছে লোকটিকে হ্যাবেনে। আমাদের পত্রিকারই এক সাংবাদিক আবিষ্কার করে ওকে। তখন থেকেই ওকে চোখে চোখে রাখছে আমাদের লোক।'

'পুলিসকে জানাননি কেন?'

'দুটো কারণ আছে। এক, ও ধরা পড়লে জামেলের জীবন বিপন্ন হতে পারে। অন্যটা হলো, পুলিস বাহিনীতেও জা ভুলির অনুগত আছে প্রচুর। সিবেলেকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হলে হয়তো তাদেরই কেউ খবরটা ফাঁস করে দেবে, পালিয়ে যাবে ও। তারচে' যেমন আছে তেমন থাকতে দেয়া হলে হয়তো ওকে অনুসরণ করেই জামেল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হব আমরা। যদিও এ দুরাশা। তবু, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'ঠিকই করেছেন।'

'আজ খুব ভোরে আরও একবার এয়ারপোর্টে গিয়েছিল সিবেলে। সেই সাংবাদিকই অনুসরণ করে তাকে।'

'কেন গিয়েছিল?'

'একজন বিদেশীকে রিসিভ করতে।'

'লোকটির বর্ণনা দিতে পারেন?'

'প্রায় ছয় ফুট লম্বা। চেহারা সুন্দর। ক্রু কাট্ চুল...গোঁফ আছে। গায়ের রঙ না ফর্সা, না কালো। কটা চোখ। ডান গালে...'

শিরদাঁড়া টান টান হয়ে উঠেছে সামসাদের। চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত। চট্ করে বলে উঠল, 'লম্বা একটা কাটা দাগ!'

'সেরকমই শুনেছি,' মাথা দোলাল বেখেয়াল নিগেল বুলি। পরক্ষণেই তাজ্জব হয়ে গেল। 'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সামসাদ কোরেশি। 'কোথায় আছে এই লোকটি?'

'কোনডেসির দিকে গেছে।' দেখাদেখি দাঁড়িয়ে গেল সে-ও। 'ব্যাপার কি! চেনেন নাকি লোকটাকে?'

ভয়ঙ্কর শীতল এক টুকরো হাসি ফুটল কোরেশির মুখে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'চিনি মানে!'

*

ব্যস্ত পায়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল মাসুদ রানা। দশটা বেজে গেছে। এগারোটার মধ্যে প্রেসিডেন্ট রামেলকে নিয়ে হারলেম পৌছতে হবে। সাড়ে এগারোটায় ওখানকার অনুষ্ঠান শুরু হবে। ও দরজার কাছে পৌছার আগেই মৃদু নকের আওয়াজ উঠল। ঝটাং করে খুলে গেল দরজা। ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাইকেল ফিশার। ফ্যাকাসে মুখে পরিষ্কার উদ্বেগ ফুটে আছে।

'কি ব্যাপার?' অবাক হলো মাসুদ রানা।

'রানা, মার্ক গর্ডন টেলিফোন করেছিল এইমাত্র,' হড়বড় করে উঠলেন ফিশার। 'ও জানতে পেরেছে হারলেমেই নাকি প্রেসিডেন্ট রামেলকে হত্যার শেষ অ্যাটেম্পট্ নেয়া হবে।'

'তাই নাকি?' পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'কিন্তু এটাই শেষ অ্যাটেম্পট্ কি করে বুঝল সে?'

'আমিও তাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম, রানা। বলল, ওর সোর্স জানতে পেরেছে নগুয়েনকে হত্যা করার জন্যে নাকি চারজনের একটা সুইসাইড স্কোয়াড এসেছে ও দেশ থেকে। দুজন মারা গেছে প্রথমদিনই। আজ যদি বাকি দুজন অ্যাটেম্পট্ নেয়, তো সেই হিসেবে...।'

'হারলেমের কোথায় অ্যাটেম্পট্ নেবে ওরা? স্কুলের ভেতরে, না বাইরে?'

'সে ব্যাপারে জানতে পারেনি কিছু গর্ডন।'

'বুঝেছি। সংবাদটা সময়মত জানাবার জন্যে গর্ডনকে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন, প্লীজ?'

'অবশ্যই। এটা রাখো,' এক টুকরো কাগজ রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'গাড়িতে বসে পড়ে নিয়ো।'

ওটায় এক পলক নজর বোলাল মাসুদ রানা। মনে হলো একটা গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং আরও দুয়েকটা বাক্য লেখা। টুকরোটা পকেটে পুরে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। আট মিনিট লাগল ওর হোটেল ইউনাইটেড নেশনস্ প্লাজায় পৌঁছতে। এমনিতেই চিন্তিত ছিল রানা, তার ওপর ফয়েই-এ অপেক্ষমাণ প্রেস ফটোগ্রাফারদের বিশাল জটলা দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল। কিন্তু লাভ নেই জেনে মনের ভাব চেপে রাখল ও। সবার চোখেমুখে কেমন এক চাপা উত্তেজনা। যেন রামেল নগুয়েনের রক্ত দেখার জন্যে মহাব্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই।

জটলার মধ্যে স্ট্রাইক ফোর্সের দশজন কম্যাণ্ডো অবস্থান নিয়ে আছে আগে থেকেই। ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে আছে তারা। এছাড়া জটলাটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে ভাইস স্কোয়াডের ডজনখানেক সদস্য।

প্রেসিডেন্টের স্যুইটের বন্ধ দরজার সামনে বসে ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল মাইক গ্রীন। রানাকে লিফট থেকে বেরোতে দেখে উঠে দাঁড়াল। আলবার্ট হিলের ডিউটি এ মুহূর্তে অফ। 'প্রেসিডেন্ট তৈরি হচ্ছেন,' রানা কাছে এসে দাঁড়াতে বলল গ্রীন।

'এখনও হচ্ছেন?' বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টা করল না রানা। 'ওদিকে শহরের একজন প্রেস ফটোগ্রাফারও বাকি নেই, সবাই এসে হাজির হয়েছে নিচে।'

'নিশ্চই প্রেসিডেন্ট নগুয়েনের মৃত্যু কামনা করছে ব্যাটারা,' শীতল কণ্ঠে মন্তব্য করল গ্রীন।

'নিঃসন্দেহে।' নক্ করল রানা স্যুইটের দরজায়।

প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক হলো, তারপরই সেফটি চেইনের 'ঝনাৎ' শব্দের সঙ্গে খুলে গেল দরজা। কুতুব মিনারের মত দাঁড়িয়ে আছে সেমিলা। চোখাচোখি হতে সসম্মানে নড করল লোকটা রানাকে। দরজা ছেড়ে সরে

দাঁড়াল।

'আর পাঁচ মিনিট, মিস্টার রানা,' বেডরূমের দরজায় উদয় হলেন রামেল। রানার চেহারায় বিরক্তি দেখে খানিকটা থমকে গেলেন। 'আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে খুব। কোন সমস্যা?'

'এখনও হয়নি, স্যার। হতে পারে।'

'ভেতরে আসুন।'

বেডরূমে চলে এল মাসুদ রানা। ড্রেসিং টেবিলের প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট্ আঁটছেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার বলুন, কি সমস্যা।'

'নিচে হাট বসে গেছে ফটোগ্রাফারদের। ওর মধ্যে থেকে কি করে বেরোব তাই ভাবছি।' দুশ্চিন্তা ওর হারলেম, কিন্তু তা চেপে গেল রানা সযত্নে।

মুচকি হাসলেন নগুয়েন। 'আমি ভাবছি না। কারণ জানি ওটা কোন সমস্যা হবে না। অন্তত আপনি যতক্ষণ সঙ্গে আছেন।' আয়নায় নট্টা দেখলেন তিনি। ঘুরে দাঁড়ালেন। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

'হ্যালো!' একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলল বেনি পেলেড।

'ফ্যালকন।'

-'লেপার্ড।'

'ম্যাসেগনা আর চিমাকে পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'বুদ্ধিটা মন্দ হয়নি, কি বলো? বরং রানার বিশ্বাস জন্মাবে আমাদের সো কলড্ গোপন সূত্রের ওপর। সেই সঙ্গে তোমার কাজও কিছুটা সহজ হবে।'

'জানানো হয়েছে মাসুদ রানাকে?'

'নিশ্চই!'

'রাইফেলটা পিক্ করার ব্যাপারে কি করলেন?'

'ভেবো না, লোক পাঠাব সময় হলে।'

'জায়গামত পৌঁছলে হয়।'

ও প্রান্তে কৌতুকের হাসি হাসল ফ্যালকন। মনে মনে বলল, পৌঁছবে তো বটেই। পৌঁছতেই হবে। তোমার খবর যে জানা হয়ে গেছে মাসুদ রানার। কাজটা আগে শেষ করো, তারপর তোমার যমও গিয়ে হাজির হবে। 'সে নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে মোটর শোভাযাত্রা। আগের মতই সামনের আসনে বসেছে রানা। পিছনে রামেল নগুয়েন একা। পিছনে দুটো গাড়িতে দোভাষী মেয়েটি, সেমিলা এবং গ্রীনসহ আরও ডজনখানেক বডিগার্ড।

চিন্তার ভারে মাথা নুয়ে আছে মাসুদ রানার। ঘণ্টাখানেক আগে হ্যাবেন থেকে টেলিফোন করেছিল সামসাদ কোরেশি, বিস্তারিত জানিয়েছে ওকে। সেই থেকে ভেবে ভেবে মাথা গরম করে তুলেছে রানা। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না এরমধ্যে বেনি পেলেড কোথায় ফিট করে। এই-ই কি সেই দুই বিদেশীর একজন? তাহলে অন্যজন কে? পেলেড-ই হত্যা করবে রামেলকে?

কিন্তু তাহলে গর্ডন কিসের ওপর ভিত্তি করে বলল এ জন্যে চারজনের সুইসাইড স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে জিম্বালা থেকে? যদি ধরা যায় এরা নয়, পেলেড-ই কাজটা করবে, তাহলে হারলেমের প্রচেষ্টা কি করে শেষ প্রচেষ্টা হয়? পেলেড তো এ দেশেই নেই। কোথায় পেয়েছে গর্ডন এ খবর? ওদিকে, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে যদি ধরে নেয়া যায় সিআইএ-র হাত আছে,

তাহলে মার্ক গর্ডন কেন সতর্ক করতে যাবে ইউনাকোকে? গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে লাগল মাসুদ রানা। কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছে না।

পরের চিন্তা বাদ দিয়ে বর্তমান নিয়ে পড়ল ও। সকালে একবার ঘুরে গেছে রানা স্কুলটা। তখনই নির্দেশ দিয়ে গেছে কোথায় কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে। কিছু কি বাদ পড়ে গেছে তখন? গুরুত্বপূর্ণ কোন পয়েন্ট নজর এড়িয়ে গেছে ওর? ইউনাকো থেকে হোটেলে আসার পথে রেডিওতে স্কুলের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ভাইস স্কোয়াড এবং স্ট্রাইক ফোর্স ইউনিট প্রধানকে একটা লাল বুইকের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে রানা।

মাইকেল ফিশারকে দেয়া মার্ক গর্ডনের সংবাদ যদি সত্যি হয়, ওই গাড়িতেই থাকবে নগুয়েনের সম্ভাব্য হত্যাকারী। গাড়িটার নম্বরও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছে রানা, একান্ত নিরুপায় না হলে যেন গাড়িটি লক্ষ্য করে একটি গুলিও ছোঁড়া না হয়।

বাঁক নিয়ে লেনক্স অ্যাভিনিউতে ঢুকে পড়ল গাড়ির বহর। পথের দুপাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হতশ্রী দালানকোঠা। কত বছর রঙ করা হয়নি ওগুলোয় কে জানে। নোংরা রাস্তা। নিউ ইয়র্কের মত শহরে এমন জায়গাও আছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

'আমরা হারলেম পৌছে গেছি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা।

ডার্ক বুলেটপ্রুফ গ্লাসের ভেতর দিকে উঁকি মেরে ওপাশে তাকালেন রামেল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে উঠল কপাল। 'কী জঘন্য!' বলে উঠলেন তিনি।

'ঠিক। বেকারত্বের অভিশাপে এদের এই অবস্থা। এরা উপযুক্ত চাকরি পায় না। পেলেও ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না। এখানকার শতকরা নব্বই জনই মাদকাসক্ত। খুন, রাহাজানি, বেশ্যাবৃত্তির সাম্রাজ্য এই হারলেম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এ মাটিও আমেরিকার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'এখানকার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' বললেন

প্রেসিডেন্ট। 'ড্রাইভার, গাড়ি থামাও।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল লোকটা। মাথা দুলিয়ে নিষেধ করল ও। 'সরি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। এখানে থামা যাবে না।'

'কেন? অসুবিধে কি? ওরাও কালো, আমিও কালো। আমি আমার সহানুভূতি জানাতে চাই ওদের।'

'আপনি কালো হতে পারেন, স্যার, কিন্তু হারলেমে বহিরাগত। বাইরের কাউকে পছন্দ করে না এরা। কাউকেই না। তাছাড়া সহানুভূতিকেও মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।' ভিউ মিররে নগুয়েনের ছায়ার চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'মনে করবেন না হারলেমে আপনাকে ঢোকানোটা খুব একটা সহজ কাজ ছিল। এ পথে আসা-যাওয়ার অনুমতির জন্যে এখানকার কমিউনিটি লিডারদের সঙ্গে প্রচুর দেন-দরবার করতে হয়েছে আমাকে। ঠিক এই মুহূর্তে সশস্ত্র মাস্তানদের বন্দুকের আওতায় আছি আমরা। যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে দিত ওরা এতক্ষণে যদি নেতাদের অনুমতি না নিয়ে ঢুকতাম।'

'সঙ্গে এত পুলিস দেখেও!' বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে প্রেসিডেন্টের দু চোখ। 'বলেন কি?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। 'এরা বেপরোয়া। পুলিস কেন, কাউকেই কেয়ার করে না।'

চুপ মেরে গেলেন রামেল নগুয়েন।

কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে স্কুলের অ্যাপ্রোচ রোডে ঢুকে পড়ল গাড়ি। দু পাশে অপেক্ষমাণ জনতার সারি। তাদের সামনে ছোট ছোট স্কুলের ছেলেরা হাতে খুদে জিম্বালান পতাকা হাতে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে। একটিও সাদা মুখ নেই ওর মধ্যে। প্রতিটি কালো। বিপুল উৎসাহে পতাকা নাড়ছে ছেলেরা। ভেতর থেকে রামেল নগুয়েনও হাত নাড়লেন তাদের উদ্দেশে।

সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ নেই মাসুদ রানার। আটজন স্নাইপার স্কুলের সবচেয়ে কাছের বাড়িগুলোর ছাদে অবস্থান নিয়েছে। সবাইকে দেখতে পাচ্ছে রানা, রাইফেলের টেলিস্কোপ লাগানো নল বের করে কার্নিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। উঁচু চুড়োওয়ালা ক্যাপের জন্যে ছায়া পড়েছে মুখে, চেহারা চেনা যাচ্ছে না কারও।

রানার নির্দেশে স্কুলের চারদিকের সাতশো গজের মধ্যে প্রতিটি বাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয়েছে সকালে। এতে এলাকাবাসী খেপে গিয়েছিল সাঙ্ঘাতিক রকম। জানত রানা, এমনটি না ঘটে পারে না। তাই কায়দা করে ভাইস স্কোয়াড থেকে বাছাই করা নিগ্রো পুলিসদের দিয়ে করিয়েছে ও কাজটা। যে জন্যে বেশিদূর গড়াতে পারেনি এদের অসন্তোষ।

উন্মুক্ত লোহার গেট দিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল শোভাযাত্রা। এখানটা ফাঁকা। কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। যারা মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার, তারা দু'ঘণ্টা আগেই ঢুকে পড়েছে স্কুল অডিটরিয়ামে। চট করে ডান কানে একটা সাদা রঙের খুদে ইয়ারপীস ঢুকিয়ে দিল মাসুদ রানা। ভাইস স্কোয়াড এবং স্ট্রাইক ফোর্স লীডারের কথা শুনতে পাবে ও এটার সাহায্যে। স্কুলের পোর্টিকোর নিচে লিমুজিন থেমে দাঁড়াতেই বেরিয়ে পড়ল রানা। রাস্তার ওপারের দালানগুলোর ছাদে এক নজর চোখ বুলিয়ে পিছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজার হাতল ধরে গ্রীন ও সেমিলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওর পাঁচ হাতের মধ্যে সার দিয়ে অপেক্ষা করছে অভ্যর্থনা কমিটি—স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং স্থানীয় পাঁচজন কমিউনিটি লীডার। ওরা দুজন এসে জায়গামত অবস্থান নিতে দরজা মেলে ধরল মাসুদ রানা। হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন রামেল নগুয়েন। অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান, প্রিন্সিপাল এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে। এরপর এক এক করে

পাঁচ কমিউনিটি লীডারের সঙ্গে পরিচয়ের পালা।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘাম ছুটে গেল মাসুদ রানার। ঘন ঘন চারদিকে তাকাচ্ছে ও। সেমিলা আর গ্রীনেরও একই অবস্থা। পরিচয়পর্ব শেষ হতে স্কুলের উঁচু বারান্দায় উঠে গেলেন রামেল সদলবলে। জোর পা চালিয়ে তাঁর ডান দিকে গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল মাসুদ রানা। রামেলের বাঁ দিকে দেয়াল, এদিকটা ফাঁকা, তাই। সেমিলা থাকল রানার পিছনে।

মাইক গ্রীন ইচ্ছে করেই খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। কারণ, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে স্টেজে থাকছে না সে। তাকে রানা স্টেজের ভারি কার্টেনের আড়ালে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কার্টেনের ফাঁক দিয়ে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার ওপর লক্ষ রাখবে সে। রানা আর সেমিলা থাকবে স্টেজে, প্রেসিডেন্টের পিছনেই ওদের বসার স্থান করা হয়েছে।

দশ

জিম্বালান সিকিউরিটি পুলিস নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে আট বছরের চাকরিটা খুইয়েছে ওয়াল্টার ম্যাসেগনা। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়েছে তার হারাম কামাইয়ের পথটিও। প্রয়োজন পড়লে আগের মত আর যখন তখন লা টামবিয়েরের ভয় দেখিয়ে এর-ওর কাছ থেকে টাকা খসানো যাবে না, এ-ও কি সহ্য করা সম্ভব? রাগে মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছিল ম্যাসেগনা নগুয়েনের ওপর।

তাই যখন জানতে পেল যে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটছে তাদের প্রাক্তন ডেপুটি চীফ টমাস সিবেলে এবং এ কাজ সমাধা করার জন্যে চারজনের একটা স্কোয়াড গঠনের ব্যাপারে উপযুক্ত লোক খুঁজছে, অমনি তার সঙ্গে দেখা করে দলে ভেড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল ম্যাসেগনা। দেখা হলো, এবং সৌভাগ্যই বলতে হবে, প্রায় বিনাকষ্টে দলে জায়গাও পেয়ে গেল সে।

এরপর কোনডেসির বাইরে পাহাড়ী এলাকায় টেলিস্কোপিক সাইটজোড়া রাইফেলের সাহায্যে দলটিকে দূরের লক্ষ ভেদ করার ট্রেনিং দেয়া শুরু হলো। এ অস্ত্র আগে কখনও চালায়নি তারা। প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু দুদিন পর পরিত্যক্ত হয় ট্রেনিং। অপ্রত্যাশিতভাবে এক বিদেশীকে নিয়ে এসে ওদের চারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় টমাস সিবেলে। পরিচয় বলতে কেবল লোকটির নাম জানানো হয় ওদের, তাও ছদ্মনাম। লেপার্ড।

ম্যাসেগনা এবং তার সঙ্গীদের জানানো হলো, লেপার্ডকে তাদের দলনেতা মনোনীত করা হয়েছে। তাদের কাজ হবে লেপার্ডকে সহায়তা করা, তার প্রতিটি নির্দেশ বিনাপ্রশ্নে পালন করে যাওয়া। এবং নতুন অস্ত্রচালনা শেখারও কোন প্রয়োজন নেই। ওরা যাতে অভ্যস্ত, পিস্তল, ওতেই চলবে। সিবেলের হুকুম সবাই মেনে নিলেও লেপার্ডকে খুব সহজভাবে নিতে পারল না কেউ। কিন্তু কি আর করা! কর্তার আদেশ। মুখ বুজে লেপার্ডকে অনুসরণ করে গেল ওরা।

দলনেতার নির্দেশ পালন করতেই আজ এখানে এসেছে ওয়াল্টার ম্যাসেগনা। আগের জন ব্যর্থ হয়েছে কাজটা করতে। কাজেই, যে করে হোক, এবার তাকে কাজটা করতে হবে। লেপার্ড জানিয়েছে ওকে, তাছাড়া ও নিজেও জানে এটাই শেষ প্রচেষ্টা। অতএব ব্যর্থ হওয়া চলবে না তাকে

কিছুতেই। এতে যদি মৃত্যু হয় ম্যাসেগনার, জা ভুলির সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে তার পরিবারকে। জাতীয় বীরের মর্যাদা দেয়া হবে তাকে। 'দেশমাতৃকার সেবায় আত্মউৎসর্গকারী' হিসেবে বিবেচিত হবে সে জিম্বালার ই[illegible]সে।

এক ঘন্টারও কিছু বেশি সময় আগে যখন অডিটরিয়ামে প্রবেশ করে ওয়াল্টার ম্যাসেগনা, অন্য সবার মত তাকেও আপাদমস্তক সার্চ করা হয় এবং আমন্ত্রিতদের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় তার টিকেটের সিরিয়াল নাম্বার। অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় টিকেটগুলো, যে টাকা এই স্কুলের উন্নয়নে ব্যয় হবে। পুলিসের খাতায় যাদের নামে একটি আঁচড়ও নেই, বেছে বেছে তাদের কাছেই বিক্রি করা হয়েছে এগুলো। ওরই একটা আজ লেপার্ডের এক কুরিয়ারের মাধ্যমে হাতে পেয়েছে ম্যাসেগনা।

ঢোকার সময় সার্চ করে তার কাছে কিছুই পায়নি নিরাপত্তা রক্ষীরা। কিন্তু এখন আছে। একটা বেরেটা, শিরদাঁড়ার ওপর প্যান্টের ভেতর গুঁজে রেখেছে ম্যাসেগনা। সময় মত অস্ত্রটা বিশেষ এক জায়গায় স্কচ টেপ দিয়ে জড়িয়ে রাখার জন্যে স্কুলের এক জেনিটরকে মোটা টাকা দিতে হয়েছে। অতিথিরা ভেতরে ঢোকার কয়েক মিনিট আগে পুরো স্কুল বিল্ডিং সার্চ করে দেখেছে পুলিস। ওরা সার্চ সেরে বেরিয়ে যেতেই অস্ত্রটা একটা সিসটার্নের পিছনের ফাঁকে টেপ দিয়ে আটকে রেখে গেছে সে। সংগ্রহ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি ম্যাসেগনাকে।

মনে মনে বেশ খানিকটা অহঙ্কার বোধ হলো তার। অবশেষে তার হাতেই মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে রামেল নগুয়েনের। আর কয় মিনিট আছে তার আয়ু? বাইরের হৈ-চৈ কানে এসেছে ম্যাসেগনার, তার মানে পৌঁছে গেছে রামেল। অডিটরিয়ামের ও মাথায় মঞ্চের পাশে দুই পাল্লার চওড়া, ভারি কাঠের তৈরি বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে থাকল ওয়াল্টার ম্যাসেগনা। তার

মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে আছে দরজাটা। ওই পথেই ভেতরে ঢুকবে নগুয়েন।

চমকে উঠল ম্যাসেগনা। বাইরে থেকে জোর ধাক্কা খেয়ে আচমকা খুলে গেল দরজাটা, পাল্লা দুটো দুপাশের দেয়ালে আছড়ে পড়ল দড়াম করে। দোরগোড়ায় কানে ইয়ারপীস লাগানো নিষ্ঠুর চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র লোকটাকে চিনে ফেলল ম্যাসেগনা। ওর নাম মাসুদ রানা। গত দুদিন থেকে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর ছবি ছাপা হচ্ছে এ লোকের। এ-ই সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে রামেল নগুয়েনকে।

ভাবলেশহীন চেহারা মাসুদ রানার। ভেতরে অভ্যাগতদের কলগুঞ্জন থেমে গেছে। সবার দৃষ্টি এখন ওর ওপর। এক মুহূর্ত পর সেমিলাকে পাশে নিয়ে রামেল নগুয়েন এবং প্রিন্সিপ্যাল ঢুকে পড়লেন ভেতরে। এরপর পাঁচ কমিউনিটি প্রধান। জটলার পিছনে নিজেকে আড়াল করে মঞ্চের পিছনে ঝোলানো ভারি পর্দার ওপাশে পৌঁছে নিজের জায়গায় অবস্থান নিল মাইক গ্রীন। ওদিকে প্রেসিডেন্টকে মাঝখানে নিয়ে অন্যরাও যার যার আসনে বসে পড়েছে। রামেল নগুয়েনের পিছনে একটু বাঁয়ে বসেছে সুন্দরী দোভাষী। তার সামান্য ডানে মাসুদ রানা আর সেমিলা।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পর আবার গুঞ্জন শুরু হলো দর্শকদের মধ্যে। সবার নজর এখন রামেল নগুয়েনের দিকে। দেখে মনেই হয় না মানুষটির প্রাণের ওপর হামলা হয়েছিল মাত্র দুদিন আগে। এখনও মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে মাথার ওপর। ওটাই সবার আলোচনার বিষয়বস্তু এ মুহূর্তে।

রামেল নগুয়েনের সঙ্গে নিচু গলায় কিছু বাক্য বিনিময় করলেন প্রিন্সিপ্যাল। তারপর উঠে পায়ে পায়ে লেকটার্নের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চুপ মেরে গেল অডিটরিয়াম। 'উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,' গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন প্রিন্সিপ্যাল। 'আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই মার্কিন

প্রেসকে, যাঁদের কল্যাণে আজ এখানে উপস্থিত জিম্বালার মাননীয় প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আসুন, আমরা আমাদের মহামান্য অতিথিকে হারলেমের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।'

করতালির প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো। ডানে-বাঁয়ে তাকাল ওয়াল্টার ম্যাসেগনা। এই-ই সুযোগ, ভাবল সে। স্প্রিঙের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে, বেরেটা ধরা ডান হাত তুলল দ্রুত। ম্যাসেগনার পাশের আসনে ছিল এক বৃদ্ধা। হাততালি থামিয়ে বাঁশির মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিল সে। তীব্র আতঙ্কে চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়ল পিছনের জনের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল অডিটরিয়ামের পরিবেশ।

ওদিকে চিৎকারটা কানে যাওয়ামাত্র ঝট্ করে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রানা সামনে। ম্যাসেগনার চোখে চোখ রেখে রামেল নগুয়েনের চেয়ারের খাড়া পিঠের ওপরের কিনারা আঁকড়ে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে চেয়ারটা চিত করে শুইয়ে দিল নিজের পায়ের কাছে। গড়িয়ে মেঝেতে পড়লেন প্রেসিডেন্ট।

চারদিকে অনবরত চেয়ার আছড়ে পড়ার শব্দ, সেই সঙ্গে মহিলা এবং শিশুদের কান্নার আওয়াজ। এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হল থেকে বেরিয়ে যওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রত্যেকে। সেমিলার ওপর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে সামনের দিকে লাফ দিল মাসুদ রানা। সামনে বাধা হয়ে জড় পদার্থের মত দাঁড়িয়ে থাকা প্রিন্সিপ্যাল ওর কাঁধের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল এক পাশে। প্রচণ্ড আতঙ্কে বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লোকটার, আড়াল নেয়ার কথা মনেই জাগেনি হয়তো।

ভেতরের যে পরিস্থিতি, তাতে গুলি করার প্রশ্নই আসে না এ মুহূর্তে। নির্ঘাত আর কারও গায়ে লেগে যাবে। তাই সময় নষ্ট না করে ছুটল মাসুদ রানা। সুযোগটা পুরোপুরি-ই নিল ওয়াল্টার ম্যাসেগনা। রানা স্টেজের কিনারায় পৌঁছতেই ট্রিগার টেনে দিল সে। বাঁ বাহুতে কেউ যেন স্লেজ-হ্যামারের প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে দিয়েছে রানার, তীব্র বেগে একশো আশি ডিগ্রি পাক খেল দেহটা। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো রানা, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল স্টেজে। হাত থেকে ছুটে গেছে ওয়ালথার।

এইবার স্টেজ লক্ষ্য করে ছুটে এল ওয়াল্টার ম্যাসেগনা। কিন্তু তিন কদমের বেশি এগোবার সুযোগ পেল না। পর্দার আড়াল ছেড়ে আগেই বেরিয়ে এসেছিল মাইক গ্রীন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। হাতের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন তুলে ধীরেসুস্থে তাক করল সে ম্যাসেগনার বুকের মাঝ বরাবর। পরপর দু বার ট্রিগার টানল। স্টেজের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল লোকটা। উড়ে পিছিয়ে গেল তিন-চার হাত। ধপাস্ করে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ল।

মাসুদ রানার দিকে এক পলক তাকিয়ে ছুটে গেল গ্রীন ম্যাসেগনার কাছে। চোখ খোলা ম্যাসেগনার, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নেই। অস্ত্রটা ধরা আছে হাতে। এক লাথি মেরে হাতের মুঠো থেকে ওটা খসিয়ে দিল গ্রীন। ঝুঁকে পালস্ পরীক্ষা করল লোকটার। রক্তে ভেসে গেছে মেঝে।

সিধে হলো মাইক গ্রীন। উঠে বসেছে মাসুদ রানাও। ক্ষত আঁকড়ে ধরে মুখ বিকৃত করে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখাচোখি হতে মাথা দোলাল গ্রীন। 'ডেড!' কাছে এসে রানাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল। হাতের দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল। 'আঘাতটা কিরকম?'

'বোঝা যাচ্ছে না।' রামেল নগুয়েনের দিকে এগিয়ে গেল মাসুদ রানা।

সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। একটা রুমাল দিয়ে তাঁর গায়ের ধুলো ঝাড়ছে সেমিলা। প্রিন্সিপ্যাল এবং পাঁচ নেতা হতভম্ব হয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে দূরে। 'আপনি ঠিক আছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট?'

'আমার কথা বাদ দিন। আপনার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানো উচিত।'

এতক্ষণে যেন প্রাণ এবং ভাষা দুটোই একসঙ্গে ফিরে পেল প্রিন্সিপ্যাল। ব্যস্ত পায়ে স্টেজের কিনারার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। চোখ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল ম্যাসেগনার মৃতদেহের দিকে। 'অস্ত্র নিয়ে কি করে ভেতরে ঢুকল লোকটা?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল সে। 'পুলিস সার্চ করেনি একে ঢোকার সময়?'

কেউ উত্তর দিল না তার প্রশ্নের। দু জোড়া ছুটন্ত বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। পরমুহূর্তে ভাইস স্কোয়াডের দুজন পুলিস এসে ঢুকল ভেতরে। নিশ্চয়ই গুলির শব্দে ছুটে এসেছে এরা। ততক্ষণে প্রায় খালি হয়ে গেছে অডিটরিয়াম।

'জলদি একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো,' তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল মাইক গ্রীন। 'হলে ঢোকার সব দরজা বন্ধ করে দাও। ডেডবডি না সরানো পর্যন্ত প্রেসের লোক ঢুকতে দেয়া চলবে না ভেতরে।'

'ইয়েস স্যার।' ঘুরে উল্টো ছুটল তাদের একজন। অন্যজন দ্রুতহাতে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল।

নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে রানার বাহু শক্ত করে বেঁধে দিল মাইক গ্রীন। ভেতরের আর কারও মুখে কোন কথা নেই। প্রায় প্রত্যেকেই চেয়ে আছে মৃতদেহটার দিকে। নগুয়েনকে খানিকটা চিন্তিত মনে হলো। দরজায় টোকার আওয়াজ উঠল। ভেতরে ঢুকল এক সার্জেন্ট, হাঁপাচ্ছে লোকটা। ম্যাসেগনার লাশটা এক পলক দেখল। তারপর রানাকে বলল,

'অনেকক্ষণ থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু রিপ্লাই পাচ্ছি না আপনার, স্যার।'

বেল্টের সঙ্গে লাগানো রিসিভারের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। সকেট থেকে অজান্তেই কখন ছুটে গেছে সরু তারের কানেকশন, লক্ষ্যই করেনি ও। সম্ভবত যখন পড়ে গিয়েছিল, তখনই ঘটেছে কাজটা। 'ব্যাপার কি, সার্জেন্ট?'

'একটা সাইড স্ট্রীটে লাল বুইকটা আটক করা হয়েছে, স্যার। রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও মিলে গেছে।'

'আটক করা হয়েছে মানে?'

'ওটার পালাবার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ড্রাইভার ভেতরেই রয়েছে। আপনার ইন্সট্রাকশন ছাড়া কেউ মুভ করতে পারছে না।'

'আপনি থাকুন,' রানাকে বলল মাইক গ্রীন। 'আমি দেখছি ওদিকে।'

কি চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু লোকটাকে জীবিত চাই আমাদের। একান্ত প্রয়োজন না পড়লে গুলি কোরো না। করলেও কেবল অক্ষম করার জন্যে করবে, হত্যার জন্যে নয়।'

'ভাববেন না,' লাফিয়ে স্টেজ থেকে নেমে পড়ল মাইক গ্রীন।

'দাঁড়ান!' পিছন থেকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল সেমিলা। 'আমিও যাবো,' বলে সমর্থন পাওয়ার আশায় রানার দিকে তাকাল সে।

'যান। তবে যা বললাম, মনে রাখবেন।'

বেরিয়ে গেল ওরা দুজন। বাইরে সাংবাদিকের বিশাল জটলা। চারদিক থেকে অসংখ্য প্রশ্ন ছুঁড়ল তারা। সেদিকে লক্ষ্যই করল না গ্রীন বা সেমিলা। ভিড় ঠেলে-গুঁতিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে লাগল। খোলা জায়গায় এসে ছুটতে শুরু করল সার্জেন্টের পিছন পিছন। শ খানেক গজ দৌড়ে জনতার ছোটখাট একটা জটলা দেখে থামল ওরা।

সরু একটা গলি। এ মাথায় রাস্তা বন্ধ করে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে একটা পুলিস কার। ও মাথায়ও রয়েছে আরেকটা। গলিটা ষাট-সত্তর গজ দীর্ঘ হবে বড়জোর। ঠিক-মাঝামাঝি জায়গায় লাল একটা বুইক স্টার্ট বন্ধ করে বসে আছে। ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। রোদের আলোয় সারামুখ চিকচিক করছে লোকটার। ঘামছে।

আশেপাশের চার-পাঁচটা বাড়ির ছাতে স্ট্রাইক ফোর্সের স্নাইপার রয়েছে। তাদের সবার অস্ত্র লোকটার দিকে চেয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। ভাইস স্কোয়াড এবং স্ট্রাইক ফোর্সের দুই ইন-চার্জকে রানার নির্দেশ জানাল গ্রীন রেডিওর মাধ্যমে। একইভাবে দেরি না করে তারাও নির্দেশটা যার যার অধীনস্থদের জানিয়ে দিল।

এবার লাল বুইকের ড্রাইভারের চোখে পড়ার জন্যে পুলিস কারটাকে অতিক্রম করে গলির মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল মাইক গ্রীন। দুহাত দেহের পাশে ছড়িয়ে রেখেছে।

'কি করছেন?' পিছন থেকে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল সেমিলা।

'লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'গাড়িটা বুবি-ট্র্যাপড্ হয়ে থাকতে পারে,' বলল ভাইস স্কোয়াড ইনচার্জ, এক লেফটেন্যান্ট।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মাইক গ্রীন। 'কিছু করার নেই। কথা বলতেই হবে। যত বেশি বসিয়ে রাখা হবে, ওর নার্ভাস ব্রেক ডাউনের আশঙ্কাও ততই বাড়বে। তার আগেই একটা বিহিত করতে চাই।'

আস্তেধীরে গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেলল মাইক গ্রীন। তারপর হোলস্টার থেকে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা বের করে তুলে ধরল শূন্যে উল্টো করে। একভাবে গ্রীনের দিকে চেয়ে আছে বুইকের ঘর্মাক্ত ড্রাইভার, চিমা ওকোরি। এবার ও দুটো পুলিস কারের বনেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলল গ্রীন।

'পাগল নাকি আপনি?' আঁতকে উঠল ইন-চার্জ। 'কাছে গেলে ও যে গুলি করবে না আপনাকে তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

'তবুও হত্যা করা চলবে না ওকে,' দৃঢ় স্বরে বলল মাইক গ্রীন। 'ওকে জ্যান্ত ধরতে হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে পিছিয়ে এল লেফটেন্যান্ট। গ্রীনের জ্যাকেট এবং অস্ত্রটা তুলে নিয়ে সেমিলাও সরে এল। ইন-চার্জ বেল্ট থেকে রেডিও বের করে কথা বলতে শুরু করল, সবাইকে জানিয়ে দিল কি করতে যাচ্ছে মাইক গ্রীন। স্ট্রাইক ফোর্স ইন-চার্জও অনুসরণ করল তাকে।

এক পা দু পা করে বুইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাইক গ্রীন, হাত ইশারায় চিমাকে জানালার কাঁচ নামাতে বলল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল লোকটা। কাঁপা হাতে নামিয়ে দিল নিজের দিকের কাঁচ। তারপর কোলের ওপর রাখা ওয়ালথার পি-ফাইভটা তুলে নিয়ে গ্রীনের তলপেট লক্ষ্য করে ধরল। জানালার পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল তাকে।

অসহায়ের ভঙ্গি করে নিজের চারদিকে তাকাল মাইক গ্রীন। সবচেয়ে কাছের স্নাইপারটিও অন্তত পঁয়ত্রিশ গজ দূরে—ওদের কথাবার্তা কেউ শুনতে পাবে না। 'মুখ খুলতে পারো এবার তুমি, বাছা,' পরিষ্কার সোয়াহিলিতে বলল মাইক গ্রীন। 'কেউ শুনতে পাবে না।'

'তুমি কে?' কপালের ঘাম মুছল চিমা। সাদা চামড়ার মুখে দেশী ভাষা শুনে অবাক হয়েছে।

'তোমার বন্ধু। ওয়াল্টার ম্যাসেগনা মারা গেছে।'

'আর নগুয়েন?'

'আফসোসের কথা, মরেনি এখনও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল লোকটা। তিক্ত স্বরে বলল, 'কিছুই করতে

পারলাম না আমরা!'

'দুঃখ কোরো না। তোমাদের ইচ্ছে আজ না হলেও কাল ঠিকই পূরণ হবে, জা ভুলি ওকে ছাড়বে না। আর তোমাদের মৃত্যুও বৃথা যাবে না। যা হোক, আমি এসেছি...'

'বুঝতে পেরেছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল চিমা।

'আমি তোমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবো।'

মনস্থির করতে দু সেকেণ্ড সময় নিল লোকটা। দেখা যায় কি যায় না, হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল। 'ঠিক আছে।' ঝট করে পিস্তলটা নিজের কানে ঠেকাল চিমা ওকোরি।

'নো...ও...ও...!' চেঁচিয়ে উঠল মাইক গ্রীন। সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল চিৎকারটা। পরমুহূর্তে সামনের দিকে ঝাঁপ দিল সে। কিন্তু অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই গর্জে উঠল চিমার ওয়ালথার পি-ফাইভ। ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকি খেল তার মাথা। রক্তে মগজে মাখামাখি হয়ে গেল বুইকের ভেতরটা।

এগারো

টাইমস-স্কয়ার কেন্দ্রের শ খানেক গজ তফাতে পরিচিত একটা বারে বসে আছে জেনি। জেনি আরনল্ড। চোখেমুখে সন্ত্রস্ত ভাব। কিসের ভয়ে যেন সিঁটিয়ে আছে ভেতরে ভেতরে। বারম্যানের রেখে যাওয়া বুরবোঁ-র গ্লাস

আধ ঘণ্টা আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। ছুঁয়েও দেখেনি জেনি।

মাঝপিঠ পর্যন্ত দুর্লভ কালো চুল তার। হালকা নীল হরিণ চোখ। দেহের বাড়ন্ত গঠনের জন্যে বয়সের তুলনায় বড় মনে হয় জেনিকে। চমৎকার স্লিম ফিগার। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা। তবে ইদানীং দুশ্চিন্তার কারণে চোখের নিচে হালকা কালির প্রলেপ পড়েছে।

স্কুল থেকে ফিরেছে জেনি আরনল্ড। কিন্তু ভয়ে বাসায় যেতে পারছে না। আজ ওদের টাকা নিতে আসার কথা। অথচ টাকা নেই জেনির কাছে। জোগাড় করতে পারেনি। কম নয়, চারশো ডলার। জেনি যখন মাদকাসক্ত ছিল, ম্যানহাটনের এক ড্রাগ সাপ্লায়ারের কাছ থেকে এই টাকার ড্রাগ ধারে কিনেছিল। সে টাকা শোধ দেয়ার মত অর্থ বা সময়-সুযোগ, কোনটিই পায়নি ও। পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর ওমুখোই আর হয়নি। ব্যাপারটা প্রায় ভুলতে বসেছিল জেনি।

কিন্তু ডিলার ভোলেনি। লোকটি স্প্যানিশ। নিউ ইয়র্ক আণ্ডার গ্রাউণ্ডের ভয়ঙ্কর দাগী আসামীদের নিয়ে গড়ে তুলেছে সে তার সাপ্লাই র‍্যাকেট। ওরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। এতদিন চুপচাপ ছিল, হঠাৎ সপ্তাহখানেক আগে দলের দুই পাণ্ডা বাসায় ফেরার পথে স্কুল গেটে পাকড়াও করে জেনিকে। তাদের সোজা কথা, যত খুশি মাল নাও বাকিতে, আপত্তি নেই। আর তা না হলে পাওনা টাকা শোধ করতে হবে এখনই।

বিপদ টের পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল জেনি আরনল্ড। নগদ তেমন কিছু থাকে না ওর কাছে। যখন যা প্রয়োজন হয় নানার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এত টাকা কি করে তাঁর কাছে চাইবে সে? কি করে এ সমস্যার সমাধান করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পরে অনেক অনুরোধ করে টাকা জোগাড় করার জন্যে সাতদিন সময় চায় জেনি ওদের কাছে। এতে খুব একটা আপত্তি তোলেনি লোক দুটো। তবে যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেছে,

নির্ধারিত দিনে টাকা না দিলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে ওর।

আজ সেই টাকা শোধ করার দিন। অথচ কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি জেনি। প্রথমে ভেবেছে নানার কাছে চাইবে। রোজই নিজেকে শোনাত, আজ রাতেই চেয়ে রাখতে হবে টাকাটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাওয়া হয়নি, সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে প্রতিদিনই। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল সাতদিন। আজ সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় জেনি ঠিক করেছে, ওরা এলে আরও সাতদিন সময় আদায় করে নেবে।

কিন্তু গুণ্ডা দুটোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার সময় প্রার্থনা করার প্রবৃত্তি বা সাহস, কোনটাই হলো না। তাই দুই ক্লাস শেষ হতে অসুস্থতার কথা বলে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জেনি স্কুল থেকে। টাইমসস্কয়ার বাউণ্ড গ্রেহাউণ্ড বাসে ওঠার আগেই ঠিক করে ফেলেছে, টাকাটা আলফ্রেড টোয়েনের কাছে ধার চাইবে কিছুদিনের জন্যে। টোয়েন ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রোলারকোস্টার বারের বারম্যান।

বন্ধু বলেই তার ওখানে গেলে পছন্দের পানীয় বুরবোঁ সার্ভ করে ওকে টোয়েন। নইলে চোদ্দ বছরের মেয়ের বারে ঢোকার নিয়ম নেই। কিন্তু এখানেও মুখ খুলতে পারছে না জেনি দ্বিধার কারণে। ভাবছে, টাকা যে আছে তার কাছে, তার-ই বা নিশ্চয়তা কি? আর থাকলেও, এত টাকা যদি দিতে না চায়? যদি সরাসরি না বলে বসে?

দেয়াল ঘড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠতে সচকিত হলো জেনি আরনল্ড। সাড়ে এগারোটা। আশপাশে তাকাল ও। বার প্রায় ফাঁকা। পিছনের টেবিলে সুদর্শন এক যুবক আনমনে খবরের কাগজ পড়ছে। ডান গালে চিকন একটা কাটা দাগ যুবকের, চোখের পাশ থেকে প্রায় থুতনি পর্যন্ত দীর্ঘ। এ টেবিল ও টেবিলে আরও কয়েকজন খদ্দের আছে।

পানীয় শেষ করে তাড়াতাড়ি কথাটা বলা উচিত আলফ্রেডকে, ভাবল

জেনি। এখনই উপযুক্ত সময়। খদ্দের বেড়ে গেলে ঝামেলা। গ্লাস তুলে পর পর দুটো চুমুক দিল ও।

'কি ড্রিঙ্ক ওটা, সুইটহার্ট?'

অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল জেনি আরনল্ড। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, অসভ্যের মত চাউনি দিয়ে চাটছে জেনির সারাশরীর।

ওর চোখে ক্রোধ দেখে মজা পেয়ে গেল যুবক। হাত বাড়াল.থুতনি স্পর্শ করার জন্যে। 'খাসা চেহারা তোমার।'

'দূর হও!' বাঁ হাত দিয়ে তার বাড়ানো হাতে থাবা মেরে বসল জেনি। আওয়াজ উঠল 'চটাশ্'।

'অ্যাই!' কাউন্টার থেকে চোখ গরম করে খেঁকিয়ে উঠল আলফ্রেড টোয়েন। 'বদমাশি করার আর জায়গা পেলে না? সরে যাও ওর কাছ থেকে!' বলতে বলতে এগিয়ে এল সে।

টোয়েনের ব্যায়ামপুষ্ট চওড়া বুক দেখে একটু যেন থিতিয়ে পড়ল যুবক। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে সরে গেল জেনির কাছ থেকে। একটা শূন্য টেবিলে বসল গিয়ে।

'ধন্যবাদ,' টোয়েনের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল জেনি আরনল্ড।

'ও কিছু নয়,' বলেই জেনির গ্লাসের ওপর চোখ পড়ল টোয়েনের। 'কি ব্যাপার! এখনও শেষ করতে পারোনি?'

ফ্যাকাসে এক টুকরো হাসি ফুটল জেনির মুখে।

'ব্যাপার কি, জেনি?' ওর মুখোমুখি বসল টোয়েন। 'তখন থেকেই দেখছি কিছু একটা ভাবছ তুমি। কি হয়েছে, আমাকে বলা যায় না?'

'বলব বলেই এসেছি, টোয়েন।'

'তাহলে দেরি কিসের? বলে ফেলো।'

'টোয়েন…ইয়ে, তোমার কাছে কিছু টাকা হবে?' বলতে লজ্জায় মাথা কাটা গেল জেনির। আপেলের মত রাঙা হয়ে উঠল দু'গাল।

'টাকা?' সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল আলফ্রেড টোয়েন। জেনি যে মাদকাসক্ত ছিল, জানে সে। ছিল। এখন অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে ওসব। সত্যিই কি ছেড়েছে? ভাবল টোয়েন, কালি কেন ওর চোখের নিচে? নতুন করে হেরোইন ধরেছে আবার? 'কেন? কি করবে টাকা দিয়ে?'

'খুব দরকার, টোয়েন। সাতদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেব,' প্রায় আকূল আবেদনের মত শোনাল কথাটা।

'সে না হয় হলো,' অন্যমনস্কের মত বলল টোয়েন। 'কত টাকা?'

'চারশো ডলার।'

আঁতকে উঠল ছেলেটা। 'সুইট জেসাস! এত টাকা দিয়ে কি করবে তুমি?' তীক্ষ্ণ চোখে জেনিকে দেখছে সে।

'সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়েছি আমি, টোয়েন। আজই টাকা না পেলে…।'

'কি হয়েছে, বলো আমাকে।'

খানিক ইতস্তত করে সমস্যাটা খুলে জানাল তাকে জেনি আরনল্ড। 'আজ ওরা টাকা না পেলে…।' এবারও কথাটা শেষ করতে পারল না মেয়েটি।

'কিন্তু, জেনি,' আমতা আমতা করতে লাগল আলফ্রেড টোয়েন। মনে হলো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি ওর কাহিনী। 'আমার কাছে এত টাকা…মানে, আমি বলছি…'

আতঙ্কিত গলায় কিছু বলে উঠল জেনি, যুবকের সব কথা কানে যায়নি। চোখের কোণে বারের সামনে একটা মোটর সাইকেল থেমে দাঁড়ানোর দৃশ্য ধরা পড়েছে ওর। দুই নিগ্রো যুবক বসা ওতে। তড়াক করে

উঠে দাঁড়াল জেনি। দ্রুত পায়ে বারের পিছনদিকে ল্যাভেটরির দিকে ছুটল।

'জেনি!' পিছন থেকে ডাকল আলফ্রেড টোয়েন। 'কি হলো?'

হাত ঝাপ্টা মেরে মোটর সাইকেলটা দেখাল ও না থেমে। পিছনের যুবক নেমে পড়েছে, পা বাড়িয়েছে বারের উদ্দেশে। 'আমাকে ধরতে এসেছে,' বলতে বলতে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। মুখোমুখি মেনস এবং লেডিস রুমের মাঝখান দিয়ে সরু একটা করিডর ধরে কয়েক পা এগোলে বাঁয়ে একটা রুম আছে। রোলারকোস্টারের ভাঙাচোরা আসবাব, অ্যালকোহলের ড্রাম ইত্যাদি রাখা হয় ওখানে। ত্রস্ত পায়ে সেদিকে ছুটল জেনি আরনল্ড। লজ্জায় ঘৃণায় চোখে পানি এসে গেছে।

খোলাই আছে দরজা। ভেতরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে দিল ও। খবরের কাগজের কয়েকটা ছোটখাট পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে উপুড় করে রাখা একটা ড্রামের আড়ালে গিয়ে বসল। কাত হয়ে দরজার দিকে চেয়ে থাকল ভয়ে ভয়ে।

ভেতরে আলো নেই। দরজার ওপরের একটা ভেন্ট দিয়ে করিডরের আলোর ছিটেফোঁটা আসছে। আস্তে আস্তে চোখ সয়ে এল জেনির। বুক ধড়ফড় করছে এখনও। সেই সঙ্গে বুক ফেটে কান্না আসছে ওর, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কেন যে এমন পাপ করার দুর্মতি হয়েছিল। এখন কি করে সামাল দেবে সে এই ঝামেলা?

হঠাৎ সামনেই খশমশ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল জেনি আরনল্ড। বিশাল এক ধেড়ে ইঁদুর ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে ওর দিকে। অন্ধকারে ওটার পুঁতির মত জ্বলজ্বলে দু চোখ টকটকে লাল আগুন ছড়াচ্ছে যেন। ভেতর থেকে উঠে আসা আর্ত চিৎকারটা মুখে হাত চাপা দিয়ে অনেক কষ্টে ঠেকাল জেনি। দাঁড়িয়ে পড়ল ঝট্ করে, এক্ পা তুলল দৌড় দেয়ার জন্যে।

কিন্তু তার আগেই কিচ্ কিচ্ তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ছুটে পালাল ইঁদুর।

ও পাশের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল। ফোঁস করে আটকে রাখা দম ছাড়ল জেনি আরনল্ড, বসে পড়ল আবার। এবং পরক্ষণেই আড়ষ্ট হয়ে গেল দরজার শব্দ কানে যেতে। খোলা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই যুবক, একটু আগে যে দুর্ব্যবহার করেছিল। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, চট্ করে লাগিয়ে দিল দরজার ছিটকিনি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল মাতালটা। 'আমি জানি ড্রামের আড়ালে বসে আছো তুমি।'

দু চোখ কপালে উঠে গেছে জেনির। বাঁশপাতার মত থর থর করে কাঁপছে সর্বশরীর। ও কি করে জানল জেনি এখানেই রয়েছে?

'বেরিয়ে এসো, সুইটহার্ট। ওদিকে তোমার ড্রাগ সাপ্লায়ারদের আটকে রাখা হয়েছে। এই ফাঁকে...।' বলতে বলতে জেনির সামনে এসে দাঁড়াল যুবক। চোখাচোখি হতে নোংরা একটা ইঙ্গিত করে খপ্ করে চেপে ধরল ওর এক হাত। হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে। অ্যালকোহলের দুর্গন্ধে বমি করে দিতে ইচ্ছে হলো। হাত ছাড়াবার জন্যে বৃথা টানা হেঁচড়া করতে লাগল জেনি।

ঠেলতে ঠেলতে পিছিয়ে নিয়ে ওকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল মাতাল যুবক। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল জেনি, কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে,আওয়াজ বের হলো না। ওর সর্বাঙ্গে চোখ বোলাল যুবক, সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ভেজা ঠোঁটের কোণে। মাতালটার অপর হাত তার টি-শার্টের তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে টের পেয়ে সভয়ে চোখ বুজল জেনি।

হঠাৎ বাইরে থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ভেঙে গেল নড়বড়ে ছিট্‌কিনি, দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। দুজনেই চমকে উঠল ওরা। লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে আরেক অচেনা যুবক। ফেড জিনস্, সাদা শার্ট এবং

কালো চামড়ার জ্যাকেট পরনে তার। ডান গালে লম্বা একটা কাটা দাগ। ঠোঁটের কোণে সিগারেট। পলকে ভেতরের পরিস্থিতি বোঝা হয়ে গেল যুবকের। মাতালের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল সে। 'ছেড়ে দাও ওকে!'

এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মাতাল। চোখ লাল করে চেয়ে থাকল অনাহূতের দিকে। জেনিকে ছাড়েনি এখনও। তবে টি-শার্টের ভেতর থেকে অন্য হাতটা বের করে এনেছে।

'যদি নিজের ভাল চাও, এই মুহূর্তে ছেড়ে দাও মেয়েটিকে,' গম্ভীর, থমথমে কণ্ঠে বলল বেনি পেলেড। এক পলক জেনির দিকে তাকাল। 'বারে ফিরে যাও তুমি। ভয়ের কিছু নেই। ওরা চলে গেছে।'

'আমি ছাড়লে তবে না...আ...আ!'

একটা হাত মাতালের দেহের চাপ থেকে কোনরকমে মুক্ত করে নিয়েই, আচমকা তার নাকেমুখে খামচি মেরে বসল জেনি। দু তিন জায়গায় ছড়ে গেল চামড়া, যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ল তার। এবার জোর ধাক্কা দিয়ে মাতালটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল জেনি, একছুটে গিয়ে আগন্তুকের পাশে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। এখনও বড় বড় হয়ে আছে চোখ, ভয় কাটেনি পুরোপুরি।

'বারে যাও,' নির্দেশের সুরে বলল পেলেড।

দুই যুবকের দিকে পালা করে তাকাল কয়েকবার জেনি। তারপর দ্রুত, কাঁপা কাঁপা পায়ে ফিরে চলল বারে। বাঁ চোখ সরু করে মাতালের দিকে চেয়ে আছে পেলেড, সিগারেটের ধোঁয়া ওটার কিনারা ঘেঁষে খাড়া উঠে যাচ্ছে।

গালের রক্ত মুছে ধারাল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মাতাল। হিংস্র হয়ে উঠেছে চেহারা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এ জন্যে তোকে পস্তাতে হবে,

কুত্তার বাচ্চা!'

তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল বেনি পেলেড, জুতো দিয়ে পিষে দিল। ছুটে এল মাতাল, ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ ছুঁড়ল তার চোয়াল লক্ষ্য করে। মোটেই ব্যস্ত হলো না পেলেড, বরং যেন অনেকটা ধীরে সুস্থে কোমর ভাঁজ করে ফুটখানেক দৈর্ঘ্য কমিয়ে ফেলল নিজের। পরক্ষণেই বিদ্যুৎ খেলে গেল দেহে, মাঝারি শক্তির একটা পাল্টা পাঞ্চ বসিয়ে দিল ও মাতালের কিডনি বরাবর।

বিদঘুটে একটা আওয়াজ বেরোল লোকটার গলা দিয়ে, দু পা পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু রেহাই দিল না তাকে বেনি। সে-ও এগোল তার সঙ্গে। একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে আবারও মারল, এবার পুরো শক্তি দিয়ে। দেহ কুঁকড়ে হাঁটু ভেঙে প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকার ধরে জমে থাকল মাতাল। বোয়াল মাছের মত হাঁ করে আছে। কাছে গিয়ে তার চুল মুঠো করে ধরল এবার বেনি, মাথাটা দড়াম করে ঠুকে দিল দেয়ালে। ছেড়ে দিতেই ওর পায়ের সামনে উপুড় হয়ে পড়ল সে। জ্ঞান হারিয়েছে। সিধে হয়ে দাঁড়াল বেনি পেলেড। ঘুরে দরজার দিকে এগোল। দরজার সামনে পৌঁছতে আলফ্রেড টোয়েনের মুখোমুখি হলো সে। হাতে একটা বেসবল ব্যাট তার, রাগে ফুঁসছে।

হেসে ফেলল বেনি পেলেড। 'ওর দরকার নেই। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি ওকে। আজ আর বিরক্ত করবে না ও মেয়েটিকে।'

কতক্ষণ অজ্ঞান দেহটির দিকে চেয়ে থাকল টোয়েন। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'হারামজাদা!' বলেই বেনির দিকে ফিরল। 'জেনিকে সাহায্য করার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার।'

'এ আর এমন কি!'

কথা বলতে বলতে বারে ফিরে এল ওরা দুজন। আগের চেয়ারে বসা

ছিল জেনি, তার দিকে চেয়ে হাসল টোয়েন। 'এবারও তোমার জন্যে কিছু করার সুযোগ পেলাম না। আমি যাওয়ার আগেই ব্যাটাকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলেছেন ভদ্রলোক। আপনাকে কোন ড্রিঙ্ক অফার করতে পারি, স্যার?' প্রশ্ন করল সে পেলেডকে।

একটা ডায়েটকোলা, যদি থাকে। জেনির মুখোমুখি বসল পেলেড। 'তুমি ঠিক আছো তো?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল জেনি আরনল্ড। 'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব। পরিচয় না হতেই সেধে আমার এতগুলো টাকার দেনা শোধ করে দিলেন। তারপর···আপনি কি করে জানলেন, ওরা আমার কাছে টাকা পায়?'

'সে সব পরে শুনো।' জেনির শূন্য গ্লাসটা দেখাল পেলেড। 'তোমার জন্যে আরেকটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিই?'

'প্লীজ!' মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে উঠল জেনির। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনার নামটা জানা হলো না।'

'জাকি হাদাদ।'

'আমি জেনি আরনল্ড।'

বেনির জন্যে একটা ডায়েটকোলা নিয়ে এল আলফ্রেড টোয়েন। অনেকটা যেন তাকে ঠেস দেয়ার জন্যেই যোগ করল জেনি, 'আপনি না থাকলে আজ কি যে অবস্থা হত আমার। আপনি কিন্তু এখনও বলেননি, ওদের আমার কাছে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে জেনেছেন।'

হাসল বেনি পেলেড। 'তোমার পিছনের টেবিলেই ছিলাম। তোমাদের দুজনের সব কথা আমার কানে এসেছে,' বলে টোয়েনের দিকে ফিরল সে। 'জেনির জন্যে আরেক গ্লাস বুরবোঁ, প্লীজ।'

কেন যেন মুখটা হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে গেল টোয়েনের। মাথা ঝাঁকাল

সে কেবল।

'পরের কথা কান পেতে শোনা আমার একটা বদ অভ্যেস,' হাসতে হাসতে বলল বেনি পেলেড। 'বিশেষ করে যখন কোন সঙ্গী থাকে না, একা একা বোরড্ ফিল করি, তখন।'

'কারও বদ অভ্যেসও যে কখনও অন্যের উপকারে আসে, আজ হাড়ে হাড়ে তা টের পেলাম। জাকি হাদাদ, না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জেনি। 'মনে হয় ইজিপশিয়ান নাম, তাই না?'

'হলো না।'

'তাহলে?'

'লেবানিজ।'

ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি দেখা দিল জেনির। 'আপনি নিশ্চই টেররিস্ট নন?'

'নিশ্চই!' মাথা দোলাল বেনি পেলেড। 'তোমরা, আমেরিকানরা, নিজেদের ছাড়া অন্য সবাইকেই নিজেদের মত করে দেখো। যদি বলতাম, আমি রুশ, তুমি ভাবতে আমি তাহলে কমিউনিস্ট। যদি বলতাম কলাম্বিয়ান, তাহলে ড্রাগ ডিলার ভাবতে। আর লিবিয়ানদের বা লেবানিজদের কি মনে করো, সে তো তুমিও জানো।'

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করেছি, মিস্টার হাদাদ।'

ডায়েটকোলার বোতলটা কাছে টেনে নিল পেলেড। 'জানি।' একটা চুমুক দিল স্ট্রয়ে মুখ লাগিয়ে। 'আমি ব্যবসা করি। মাংস প্যাকেজিঙের। সন্দেহ নেই, টেররিস্টদের মত গ্ল্যামারাস কোন পেশা নয়।'

জেনির জন্যে পানীয় নিয়ে ফিরে এল আলফ্রেড টোয়েন। গ্লাসটা রাখার ফাঁকে পেলেডের মুখের দিকে তাকাল সে এক পলক। হঠাৎ করেই লোকটির ব্যাপারে মনোভাব বদলে গেছে তার। এখন মনে হচ্ছে, ওর মধ্যে অশুভ

কিছু একটা আছে। 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন, মিস্টার?' খানিকটা কঠিন সুরে প্রশ্ন করল টোয়েন। পেলেড এবং জেনি দুজনেরই কানে বাজল।

'এই মুহূর্তে আম্মান থেকে।' মিষ্টি করে হাসল পেলেড। মানিব্যাগ বের করার জন্যে হাত ভরে দিল পকেটে। 'কত দাম হয়েছে আমাদের ড্রিঙ্কসের?'

'জেনির ড্রিঙ্কসের দাম আমিই দেবো,' দ্রুত বলল টোয়েন।

'প্লীজ,' একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল বেনি। 'আই ইনসিস্ট।'

'না, ধন্যবাদ।' দ্রুত টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল আলফ্রেড।

ভুরু কুঁচকে জেনির দিকে তাকাল পেলেড। 'হঠাৎ হলো কি তোমার বয়ফ্রেণ্ডের? খুব রেগে গেছে মনে হয়?'

'ও আমার বয় ফ্রেণ্ড না। শুধুই বন্ধু।'

'আই সী।'

'কখনও কখনও এরকম উল্টোপাল্টা আচরণ করে ও। কেন করে তা ও ছাড়া কেউ জানে না।' টোয়েনের ওপর মনে মনে চটে আছে জেনি। ও ঠিকই বুঝতে পেরেছে প্রথমে ওকে অবিশ্বাস করেছিল ছেলেটা। বিপদে বন্ধুর উচিত বন্ধুকে সাহায্য করা। অথচ তা না করে...জাকি হাদাদের দিকে তাকাল সে।

কী স্মার্ট! যেমন চেহারা, তেমনি তার অন্তর। জানা নেই শোনা নেই, কেমন হুট করে ওর চারশো ডলারের দেনাটা শোধ করে দিল। পিটিয়ে লাশ করল মাতাল যুবককে। অথচ এগুলো করা উচিত ছিল আলফ্রেডের। অন্তত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল।

হাতঘড়ি দেখল বেনি পেলেড। 'এবার উঠতে হয়। জেনি, তোমার স্কুল ছুটি হয় কটায়? বাসায় ফেরার সময় হয়ে গেছে নিশ্চই। চলো, যাওয়ার পথে তোমাকে ড্রপ্ দিয়ে যাই। দেরি হলে বাসায় চিন্তা করবে।'

মুখের হাসি মুছে গেল জেনির। আনমনে মাথা দোলাল। 'চিন্তা করার মত সেরকম কেউ নেই আমার।'

'বুঝলাম না।' বোকার মত চেয়ে থাকল বেনি।

'মা-বাবা বেঁচে নেই আমার। কার অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। ভাই-বোনও নেই। আমি একা, নানার সঙ্গে থাকি।'

'আমি খুব দুঃখিত, জেনি। খুব দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ। তাছাড়া আমার নানাও খুব ব্যস্ত মানুষ। রাত ন'টা-দশটার আগে বাসায় ফেরেন না। এখন বাসায় গিয়ে করার মত কিছু নেই। তারচে' বরং…আপনি কি ব্যস্ত?'

'নাহ্! বললাম না, কাজ নেই সঙ্গী নেই, বোরড্ হয়ে গিয়েছি!'

'ব্যবসার কাজে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কাজ শেষ। পরশু দেশে ফিরে যাব ভাবছি।'

'পরশু চলে যাবেন? কিন্তু…।'

'কিন্তু কিসের!'

'এরমধ্যে টাকাটা ফেরত…'

'থামো,' হাত তুলে বাধা দিল বেনি পেলেড। 'টাকা ফেরত চেয়েছি আমি?'

হাসি ফুটল জেনির মুখে। 'বাহ্, চাইতে হবে কেন! ধার শোধ করা আমার কর্তব্য।'

'সে তো কখন শোধ হয়ে গেছে।'

'কি করে?' বিস্মিত চোখ মেলে চেয়ে থাকল ও বেনির দিকে।

'এই যে, টাকার বিনিময়ে তোমার মত এক বন্ধু পেলাম। গল্প করে একাকিত্ব দূর হলো। আর,' যেন কোন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'পরের কথা আড়ি পেতে শোনার বদ অভ্যেসটাও অন্তত আজকের জন্যে দূর

হলো, বুঝলে না? এতেই শোধ হয়ে গেছে তোমার দেনা।'

খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল জেনি আরনল্ড। 'আপনি খুব মজার মানুষ, মিস্টার হাদাদ। আপনার মত কথায় কথায় হাসাতে ওস্তাদ এক বন্ধু আছে আমার।' হঠাৎ করেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। 'একেক সময় কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ও যদি আমার বাবা হত। পরক্ষণেই ভাবি, তাহলে তো বাঁচত না, মরে যেত।'

'তাই? কে সেই ভাগ্যবান যাকে এত ভালবাস তুমি?'

'উঁহুঁ, সে নয়। বরং তার ভালবাসা আর স্নেহ পেয়ে আমিই হয়েছি ভাগ্যবতী। লোকটা বাঙালী, নাম মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা?' চিন্তার ভান করল বেনি পেলেড। 'নামটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে!'

'গত দু'দিন পত্র-পত্রিকায় তার অসংখ্য ছবি...'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল বেনির। 'তুমি নিশ্চই ইউনাকো স্ট্রাইক ফোর্স চীফকে মীন করছ না?'

'তাকেই মীন করছি।'

'মাই গড! বলো কি? স্ট্রাইক ফোর্স চীফ তোমার বন্ধু!'

ওদের আলোচনা আর কতক্ষণ গড়াত ঠিক নেই। অকস্মাৎ আলফ্রেড টোয়েনের 'খুক' কাশি এবং 'এক্সকিউজ মি,' শুনে মুখ ফেরাল দুজনেই।

'জেনি, একটু শুনে যাও।' গলা শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল বিরক্ত হয়ে পড়েছে সে। বলে আর দাঁড়াল না, হনহন করে কাউন্টারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিরক্ত হলো জেনিও। কিন্তু মনের ভাব চেপে আসন ছাড়ল সে বেনির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। 'বলো।'

'এটা রাখো,' দশ ডলারের একটা নোট বাড়িয়ে ধরল টোয়েন ওর

দিকে। 'ট্যাক্সি ভাড়া। বাসায় চলে যাও।'

'কেন?' চোখ কোঁচকাল জেনি।

'ওর সঙ্গে এত গল্প করা ঠিক হচ্ছে না। লোকটাকে সুবিধের মনে হয় না আমার।'

জেরার সুরে বলল মেয়েটি, 'কেন এরকম মনে হচ্ছে তোমার?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, জেনি। পরিচয় নেই, কোন আলাপ না কিছু না, হঠাৎ তোমার জন্যে এতগুলো টাকা খরচ করার কি এমন প্রয়োজন পড়ল ব্যাটার? নিশ্চই কোন বদ মতলব আছে ওর। বিপদ হতে পারে তোমার, বাসায় চলে যাও।'

'কিন্তু আমি তা মনে করি না, টোয়েন। ওর মত ভদ্রলোক খুব কমই দেখেছি আমি।'

'কম দেখেছ কারণ তোমার বয়স কম। এ ধরনের ভালমানুষ অনেক্ দেখেছি আমি, জেনি। তাই তোমার ভালর জন্যেই বলছি বাসায় চলে যাও। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি ও একটা ট্রাবলমেকার।'

'আমিও বুঝতে পারছি না, লোকটার সঙ্গে আমাকে হাসিমুখে কথা বলতে দেখেই এসব চিন্তা নতুন গজাল কি না তোমার মাথায়। আসলে হয়েছে কি তোমার? হিংসে হচ্ছে?'

ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকাল আলফ্রেড টোয়েন। 'হিংসে? কি যা তা বলছ! ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে বলেই সতর্ক করতে চাইছি তোমাকে, বোঝার চেষ্টা করো।'

'আমি কচি খুকি নই, টোয়েন। ঠিকই বুঝেছি। বন্ধু বলে প্রথমে আমি তোমার কাছেই ধার চেয়েছিলাম টাকাটা। কিন্তু আমাকে তুমি বিশ্বাস করোনি। আর এই লোক নিজে থেকে আমাকে সাহায্য করেছে বলেই মন্দ হয়ে গেল, তাই না?'

'সে জন্যে আমি লজ্জিত, জেনি। দুঃখিত। ভেবেছিলাম...'

'থাক! তোমার ভাবনা তোমার কাছেই থাকুক, আমার শুনে কাজ নেই। টাকাটা রেখে দাও, পরে কাজে লাগবে।'

বেনি পেলেডের সামনে এসে দাঁড়াল জেনি। গলাটা বহু কষ্টে স্বাভাবিক রেখে বলল, 'আপনার হাতে কোন কাজ আছে এখন?'

নিরীহ ভঙ্গিতে একবার টোয়েনের দিকে তাকাল পেলেড। তারপর ফিরল ওর দিকে। 'নাহ! তেমন কোন কাজ নেই। কেন?'

'তাহলে চলুন, আর কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। আমিও ফ্রী।'

'কিন্তু কোথায় যাব? আমি তো তেমন কোন জায়গা চিনি না।'

'আমি চিনি, উঠুন,' ওপাশের চেয়ারে রাখা স্কুল ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল জেনি আরনল্ড।

'কিন্তু তোমার নানা যদি খোঁজাখুঁজি করেন তোমাকে?'

'সে আমি বুঝব, চলুন তো!'

এত সৌভাগ্য কল্পনাও করেনি বেনি পেলেড। কিন্তু তখনই ওঠার গরজ দেখাল না। টোয়েনের ওপর জেনির রাগ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যে যেন শেষ চেষ্টা করছে, এমনভাবে বলল, 'ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছ, তাই না? আমি বলি কি, ছেলেটা মন্দ নয়। ডেকে নিয়ে কি বলেছে জানি না, তবে মনে হয় ওর কথা তোমার শোনা উচিত।'

ইচ্ছে পূরণ হলো পেলেডের। ঝাঁঝিয়ে উঠল মেয়েটা। 'কার কথা শোনা উচিত, কার কথা শোনা উচিত নয়, সে আমি ভালই বুঝি। আপনি কি বেরুবেন? নয়তো আমি চললাম,' বলে সত্যি সত্যি ঘুরে হাঁটা ধরল জেনি।

'আরে আরে, দাঁড়াও! কি পাগল মেয়েরে বাবা!' দ্রুত আসন ছাড়ল বেনি। কাউন্টারের পাশ কাটাবার সময় যেন আপনমনেই বিড়বিড় করে:

তবে টোয়েনের কানে যাতে পৌঁছায়, বলতে বলতে গেল, 'কী মেজাজ! যাই, পৌঁছে দিয়ে আসি বাসায়।'

আড়চোখে টোয়েনের দিকে তাকাল বেনি। ধরা পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওর দিকেই চেয়ে আছে টোয়েন একদৃষ্টে। কোঁচকানো দু'চোখে সন্দেহের ঘন ছায়া। জেনিকে নিয়ে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক অর্থহীন ঘোরাঘুরি করল বেনি পেলেড। জমল না। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল মেয়েটি। লক্ষ করেছে ও, মুখ নেড়ে বিড়বিড় করে কী সব বকছে। হাসল পেলেড, মনে মনে ঝগড়া করছে বোধহয় টোয়েনের সঙ্গে।

হঠাৎ রেয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে উঠল। একটা সাদা বিএমডব্লিউ মোটর সাইকেলে করে ওদের পিছু নিয়েছে আলফ্রেড টোয়েন। দাঁতে দাঁত চাপল সে, রেগে উঠছে। বাহাদুর হওয়ার শখ চেপেছে মাথায়, বলল মনে মনে। বাড়াবাড়ি কোরো না, ছোকরা। ফিরে যাও।

কিন্তু তার কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে। আঠার মত সেঁটে রয়েছে পিছনে। হঠাৎ যেন জরুরী একটা কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভান করল বেনি পেলেড। 'এই যাহ্! ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে,' আপন মনে বলল সে। গাড়ির গতি কমাল।

'কি হলো?'

'একটা খুব জরুরী কাজ ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'আমি দুঃখিত,' লজ্জা পেয়ে গেল জেনি আরনল্ড। 'আমার জন্যেই হলো...'

'আরে না না! তোমার জন্যে নয়। আমি মানুষটাই এরকম। রোজ দুই একটা ভুল না করলে পেটের খাবার হজম হয় না আমার। কি করা যায়?' ঠোঁট মুড়ে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর চিন্তিত ভঙ্গিতে তবলা বাজাল পেলেড

মুহূর্তখানেক। তারপর বলল, 'চলো, জেনি। তোমাকে না হয় বাসায় দিয়ে আসি। যাওয়ার আগে কাজটা না সারলেই নয়। কাল আবার দেখা হবে, কি বলো?'

'ঠিক আছে। কিন্তু কাল আসছেন তো? নাকি তাওও ভুলে যাবেন?'

সুন্দর করে হাসল বেনি পেলেড। গতি বাড়াল গাড়ির। 'না। এ ধরনের ভুল সাধারণত হয় না আমার। ঠিকই এসে পড়ব।'

'একটায় স্কুল ছুটি হয় আমার। ঠিক দেড়টায় রোলারকোস্টারে অপেক্ষা করব আমি আপনার জন্যে।'

'রোলারকোস্টারে?' দ্বিধায় পড়ে গেছে যেন, এমন মুখভঙ্গি করল সে। 'কিন্তু... টোয়েন যদি অসন্তুষ্ট হয়?'

ঠোঁট বেঁকে গেল জেনির। ভেতরে ভেতরে নিজের মনোভাব টের পেয়ে বেশ অবাকই হলো। ওর নামটা পর্যন্ত এখন সহ্য করতে পারছে না সে। 'তাতে বয়েই গেল আমার।'

'ঠিক আছে।'

পরদিন জেনিকে বারে ঢুকতে দেখেই খানিকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল আলফ্রেড টোয়েন। 'কেমন আছ, জেনি?'

'ভাল।' গম্ভীর মেয়েটি।

'এখনও রাগ পড়েনি। বোসো, ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি।'

'আনতে পারো, তবে দাম নিতে হবে।'

আহত হলো টোয়েন। 'জেনি, প্লীজ...'

'থাক তাহলে,' দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল জেনি। 'সময় নেই। আমি এখনই বেরোব।'

আবারও কিছু বলতে যাচ্ছিল যুবক, এই সময় 'হ্যালো!' শুনে ঘুরে চাইল। ওর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কালকের সেই লোক, জাকি

হাদাদ। মুখে অমায়িক হাসি।

হাতটা অগ্রাহ্য করল আলফ্রেড টোয়েন। 'আপনি!'

'দেরি করে কাজ নেই,' বেনির বাহু ধরে টান দিল জেনি। 'চলুন, যাই।'

বুঝে গেল পেলেড, ও আসার আগেই ওকে কেন্দ্র করে এক রাউণ্ড হয়ে গেছে দু'জনের। 'সবে এলাম। একটা ডায়েটকোলা অন্তত...'

'না। এখানে নয়, আর কোথাও গিয়ে খাবেন।'

'বেশ।' টোয়েনের দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গি করল পেলেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে। বেরিয়ে গেল দুজন।

দুই মিনিটের মধ্যেই ভিউ মিররে যুবককে আবিষ্কার করল বেনি। মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে আসছে পিছন পিছন। আজ মুড ভালই আছে জেনির, এদিক-ওদিক নজর বোলাচ্ছে। আয়নায় চোখ পড়লে দেখে ফেলতে পারে টোয়েনকে। কিন্তু তা হতে দিতে চায় না সে। ব্যস্ত রাখতে হবে ওকে। গল্প বলিয়ে হিসেবে সুনাম আছে পেলেডের। বিদ্যেটা কাজে লাগাল সে। একটার পর একটা মজার চুটকি বলতে আরম্ভ করল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল জেনির অল্পক্ষণের মধ্যেই। বাইরের দিকে নজর দেয়ার সময়ই পাচ্ছে না।

এই ফাঁকে টোয়েনকে খসাবার চেষ্টা করল পেলেড। এ রাস্তা ও রাস্তা ছোটাছুটি করে বেড়াল, কিন্তু সফল হলো না। লেগেই থাকল ছেলেটা। সিদ্ধান্ত পাল্টাল এবার সে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। আর ঝুঁকি নেয়া যায় না। বিখ্যাত ইন্টিমেট রেস্তরাঁয় লাঞ্চ করল ওরা। বেরিয়ে এসে টোয়েনের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। হ্যাঁ, আছে এখনও ছোকরা। রাস্তার ওপাশে কয়েকটা পার্ক করা গাড়ির আড়ালে অপেক্ষা করছে।

'তোমার কোন কাজ নেই তো এখন?' জেনিকে জিজ্ঞেস করল সে।

'নাহ! কেন?'

'তাহলে চলো আমার গরীবখানায়। গরমে ঘোরাঘুরি না করে গল্প করি গিয়ে।'

আরও চুট্‌কি শোনার আশায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল ও। 'হ্যাঁ, সেই ভাল। চলুন। এই দেখো, কোথায় থাকেন আপনি, তা-ই তো জানা হলো না এখনও।'

'তাই বুঝি? আমি না বললে জানবেই বা কি করে? ওই যে, বললাম না, দুই একটা ভুল আমার রোজই করা চাই! সরি, মারি হিলে থাকি আমি এদেশে এলে। ছোটখাট একটা বাংলো কিনেছি ওখানে।'

বিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে মারি হিল ডিস্ট্রিক্ট পৌঁছল ওরা। কিন্তু পৌঁছেই কী এক জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল পেলেডের। এক্ষুণি না গেলেই নয়। ভুলোমনের জন্যে নিজেকে খানিক অভিসম্পাত দিল সে।

হেসে ফেলল জেনি লোকটাকে গজর গজর করতে দেখে। 'ঠিক আছে। ঘুরে আসুন আপনি। আমি ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাতে পারব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরব আমি, ওকে?'

বাংলো থেকে বেরোতেই আলফ্রেড টোয়েনের ওপর চোখ পড়ল ওর। রাস্তার ওপাশের একটা নিঃসঙ্গ ফোন বুদে দাঁড়িয়ে রয়েছে এদিকে পিছন ফিরে। মোটর সাইকেলটা গজ পঞ্চাশেক দূরে রেখে এসেছে। যেন দেখেনি, এমন ভাব করে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল বেনি। দুশো গজ মত এগিয়ে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলিতে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে এল গলিমুখে। বসে থাকল ধৈর্যের সঙ্গে। ফোন বুদ এবং ওর বাংলোর গেট, দুটোই পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে।

*

ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে মাসুদ রানা। সামনে একটা ফাইল হ্যাবেন পুলিস চীফের একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আছে ওতে। যদিও রানা যা জানতে চেয়েছিল, তার কিছুই নেই রিপোর্টে।

ওকে জানানো হয়েছে, নিরাপত্তা পুলিস নিষিদ্ধ করার পর সংস্থার সদর দফতর থেকে অসংখ্য পার্সোন্যাল ফাইল গায়েব করে ফেলা হয়েছে। যে কারণে হোটেল ইউএন প্লাজার সামনে প্রেসিডেন্ট নগুয়েনকে হত্যা প্রচেষ্টার সময়ে নিহত উক্ত দুজন সিকিউরিটি পুলিসের সদস্য ছিল কি না জানা যায়নি। তবে জানার চেষ্টা চলছে। কোন তথ্য পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে…ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক পলক নজর বুলিয়ে ফাইলটা সরিয়ে রেখে ভাবতে বসেছে মাসুদ রানা। বাঁ হাত বুকের কাছে স্লিঙে বাঁধা। অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে ও আজ, বাহুর পেশী ফুটো করে বেরিয়ে গেছে ম্যাসেগনার বুলেট। হাড় স্পর্শ করতে পারেনি।

ওই ঘটনার পর স্বভাবতই রামেলের হারলেমের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে ওরা হোটেলে। ওখানে পুরো দেড় ঘণ্টা নিভৃতে আলোচনা করেছে রানা প্রেসিডেন্ট নগুয়েনের সঙ্গে। অত্যন্ত গোপনীয় আলোচনা।

এর ফল কি হবে, তা সন্ধের আগেই জানা যাবে। বিকেল তিনটেয় জাতিসংঘে সুদানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসবেন রামেল নগুয়েন, তারপর। ওই বৈঠকের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

ভাবছে মাসুদ রানা।

বারো

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে জেনি ভাবল বোধহয় জাকি হাদাদ ফিরে এসেছে। হয়তো ভুলে ফেলে গেছে কিছু। হাতের ম্যাগাজিনটা সেন্টার টেবিলে রেখে সোফা ছাড়ল ও। সামান্য বিরতি দিয়ে আবার বাজল বেল। তাড়াতাড়ি পা চালাল জেনি। 'কে?' ছিটকিনি খুলে দরজা সামান্য ফাঁক করল, সিকিউরিটি চেইন খোলেনি।

'জেনি?'

ফাঁকে চোখ রাখল ও। টোয়েনের মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছে । 'তুমি!' বিস্মিত হলো মেয়েটি ।

'দরজা খুলবে, না বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলতে হবে আমাকে?'

চেইন খুলে পাল্লাটা আরেকটু মেলে ধরল ও, কিন্তু সরে দাঁড়াল না । 'তুমি কি করে জানো আমি এখানে?'

'তোমাদের অনুসরণ করে এসেছি আমি,' বলল টোয়েন । 'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, জেনি । লোকটা ছিল বলে আসতে পারিনি এতক্ষণ ।'

চরম বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল জেনির। 'তার মানে আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ তুমি?' বলেই রেগেমেগে তার মুখের ওপর সজোরে লাগিয়ে দিতে গেল দরজা। কিন্তু ধরে ফেলল আলফ্রেড টোয়েন।

'হ্যাঁ, করেছি । কারণ তোমাকে নিয়ে আমি চিন্তিত,' বাঁ হাত বাড়িয়ে জেনির কাঁধ ধরল টোয়েন, তারপর ঠেলে সরিয়ে দিল তাকে সামনে থেকে।

'বেরিয়ে যাও , টোয়েন!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল জেনি। 'আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

মোলায়েম কণ্ঠে বলল যুবক, 'করব না। আমি শুধু কথা বলতে এসেছি তোমার সঙ্গে।'

'কোন কথা নেই! বেরিয়ে যাও। '

'তুমি এভাবে চেঁচাতে থাকলে প্রতিবেশীদের কেউ না কেউ নিশ্চই টেলিফোন করে দেবে পুলিসে। তাই কি চাও তুমি ? সে ক্ষেত্রে তোমাকে নিয়েও টানাহ্যাঁচড়া পড়ে যাবে , জেনি। কারণ তুমি প্যারোলের শর্ত ভঙ্গ করেছ। পুলিসের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত বাসার বাইরে একমাত্র স্কুল ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই তোমার, ভুলে গেলে সে কথা?'

শান্ত হয়ে গেল জেনি। টোয়েন মিথ্যে বলেনি। পুলিস ওকে এখানে আবিষ্কার করতে পারলে অন্যরকম দাঁড়াবে ব্যাপার। 'ঠিক আছে , বলো কি বলতে এসেছ। তারপর বিদেয় হও দয়া করে। তোমাকে আমি বন্ধু বলে জানতাম। কিন্তু তুমি...'

'আমি এখনও তোমার বন্ধু, জেনি।'

'তাই বুঝি এত জেলাস ?'

'জেলাস ! বুদ্ধি খাটাও, জেনি। কি বলছ তা তুমি নিজেও জানো না। তুমি আমার প্রেমিকা নও যে ওই লোকটাকে হিংসে হবে আমার। তুমি আমার বন্ধু। আমি চাই না তোমার ক্ষতি হোক। '

'তাই বুঝি? লোকটা আমার কি ক্ষতি করবে বলে আশঙ্কা করছ তুমি?' বাঁকা হাঁসি দেখা দিল জেনির ঠোঁটের কোণে।

'জানি না। কিন্তু জেনি, বিশ্বাস করো, আমার মন বলছে ভয়ঙ্কর কিছু

একটা আছে লোকটার মধ্যে। স্বীকার করি তোমাকে সে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাই বলে...লোকটা অপরিচিত। তার সঙ্গে এত মাখামাখি কি ঠিক হচ্ছে তোমার?'

'মাখামাখি! মানে?'

'মানে, বলতে চাইছি উদ্ভট কল্পনার জগতে বিচরণ করছ তুমি। চোখ খোলার চেষ্টা করো।'

'শেষ হয়েছে তোমার কথা?'

কিছুক্ষণ জেনির মুখের দিকে চেয়ে থাকল টোয়েন। আরও কিছু বলবে বলে মুখ খুলেও বুজে ফেলল। ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'ফিরে যাও, টোয়েন। আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল যুবক। 'বেশ। যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আরেকবার ভেবে দেখো...'

'দেখেছি,' হাত তুলে খোলা দরজা দেখাল ওকে জেনি। 'আউট।'

ঘুরে দাঁড়াল টোয়েন। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। কোনদিক না তাকিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল সে। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকল জেনি। হঠাৎ করেই কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন দুর্ব্যবহার করল ও টোয়েনের সঙ্গে? জেনির বন্ধুদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। বড় ভাইয়ের মত। কিন্তু টোয়েন-ই বা কেন বুঝতে চায় না জেনিরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে আর সবার মত? বন্ধু বাছাই করার অধিকার আছে?

দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল জেনি আরনল্ড। কিচেনের দিকে পা বাড়াল। উত্তেজনায় মাথা ধরে গেছে, কফি বানিয়ে খাবে এক কাপ। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করল, এখনই নয়, দু-চারদিন পর রোলারকোস্টারে যেতে হবে। টোয়েনের কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেবে ও। ঘড়ি দেখল জেনি, সবে চারটা। জাকি হাদাদ আসতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি।

ভাল লাগছে না একা একা।

কফি নিয়ে ড্রইং রুমে ফিরে এল ও। ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল আবার। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে, কিন্তু মন বসাতে পারছে না। বার বার টোয়েনের মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বিরক্ত হয়ে ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলল ও। কফি শেষ করে উঠল। খিদে খিদে লাগছে। ঘরে কিছু নেই। সঙ্গে ছয় ডলার আছে ওর। বাইরে থেকে কিছু খেয়ে আসা যাক বরং। সময়ও কাটবে, খোলা হাওয়ায় মাথার যন্ত্রণাও দূর হবে।

দরজায় তালা মেরে চাবিটা সঙ্গে রাখল জেনি। পাঁচটার আগে ফিরতে হবে। নইলে জাকি হাদাদকে হয়তো বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

তখনও ফোন বুদের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল আলফ্রেড টোয়েন। স্থান ত্যাগ করেনি সে আসলে। জেনিকে দেখাবার জন্যে কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। মারি হিলের এই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, যে কারণে সুবিধেই হয়েছে। অকারণে ওর বুদের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকাটা কারও চোখে পড়েনি। একটা টেলিফোন অবশ্য করেছিল সে এক বন্ধুকে। এখানে আসার পরপরই।

দরজায় তালা মেরে জেনিকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াল টোয়েন। রিসিভার তুলে একের পর এক ডিজিট চাপতে শুরু করল। কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না। মাত্র দশ গজ দূর দিয়ে বুদের পাশ কাটালেও এদিকে তাকাল না মেয়েটি। হেঁটে চলে গেল সোজা। বেরিয়ে এল আলফ্রেড টোয়েন। সামনের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত চেয়ে থাকল ওর দিকে।

এবার দ্রুত চার দিকে নজর বোলাল। কেউ নেই, খাঁ খাঁ করছে রাস্তা।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে আরম্ভ করেছে । শুকিয়ে গেছে মুখের ভেতরটা। রাস্তা পার হয়ে জাকি হাদাদের বাংলোর সীমানা দেয়ালের ভেতর ঢুকে পড়ল সে । আরেকবার আশপাশটা ভাল করে দেখে ছোট্ট লন অতিক্রম করল । দাঁড়াল দরজার সামনে।

জানে তালা মারা, তবু একবার হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরল না। ওয়ালেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করল টোয়েন। ফ্রেম এবং দরজার মাঝখানে সামান্য ফাঁক রয়েছে। ভেতরে তালার লিভারটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ক্রেডিট কার্ডের এক প্রান্ত ঠিক লিভার বরাবর আস্তে করে চেপে ঢুকিয়ে দিল টোয়েন। তারপর ভেতরদিকে ঠেলা দিতে লাগল লিভারটা। একটু একটু করে চাপ বাড়াতে লাগল।

উত্তেজনায় গরম হয়ে উঠেছে দেহ। মনে হয় জ্বর এসেছে বুঝি। গরম বাতাস বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। সেই সঙ্গে সারাদেহ কাঁপছে। মৃদু 'কুট্' আওয়াজটা শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল মনে। খুলে গেছে তালা। চট্ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল আলফ্রেড টোয়েন, লাগিয়ে দিল দরজা। নিজের চারপাশে নজর বোলাল ও। এটা লাউঞ্জ। ওর ঠিক সামনেই একটা দরজা। আরেকটা দরজা আছে বাঁ দিকে। দুটোই বন্ধ।

কি মনে করে সামনের দরজাটার দিকে পা চালাল টোয়েন। নব্ ঘোরাল আস্তে করে, খোলাই আছে। এটা বেডরূম। কিন্তু ভেতরের অবস্থা দেখে বোঝা গেল কেউ থাকে না এখানে। বেরিয়ে এল সে। এবার অন্য দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এটাও খোলা। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক ডবল খাট। বিছানাটা করা আছে মিলিটারি কায়দায়। একপাশে একটা ওয়ারড্রোব। পায়ে পায়ে ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল টোয়েন। দেখেই বুঝতে পেরেছে এই রূমেই থাকে রহস্যময় মানুষটি। জাকি হাদাদের গালের কাটা দাগটা মনে পড়তে গায়ের ভেতর কেমন যেন করে উঠল ওর।

ওয়ারড্রোবটিও খোলা, ভিড়িয়ে রাখা আছে পাল্লা। আস্তে করে ডানদিকের পাল্লাটা খুলল আলফ্রেড টোয়েন। ভেতরে ইস্ত্রি করা কাপড়-চোপড় সুন্দর করে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা। এছাড়া অন্য কিছু নেই এপাশে। অন্য পাল্লাটা খুলল এবার টোয়েন। হ্যাঙ্গারে ঝুলছে দুটো ফেড জিনস্, একজোড়া কালো ফ্লানেল এবং ধূসর রঙের একটা জ্যাকেট।

নিচের তাকে একটা হোল্ডঅল দেখা গেল। খালি। ভেতরে নেই কিছু। সিধে হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছিল আলফ্রেড টোয়েন, এই সময় চোখের কোণে কুচকুচে কালো কি যেন ধরা পড়ল। আবার ঝুঁকল সে। একটা অ্যাটাশে কেস—ওয়ারড্রোবের ভেতরদিকে, পিছনের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ল টোয়েন হাঁটু মুড়ে।

আলতো করে কেসটা বের করে নিয়ে এল। বেশ ভারি জিনিসটা। গুড় গুড় করে উঠল তার বুকের ভেতর, কি আছে এতে? পায়ের কাছে রাখল সে ওটা। দৃষ্টি চট্ করে ঘুরে এল ভিড়িয়ে রেখে আসা দরজার ওপর দিয়ে। কপালের ঘাম মুছে কেসটার তালার দিকে নজর দিল আলফ্রেড টোয়েন। কম্বিনেশন লক। চারটে শূন্য রয়েছে ওপেনিঙ পয়েন্টে।

'ওয়ান টু থ্রী ফোর।' কেউ বলে উঠল পিছন থেকে।

গলাটা কানে যাওয়ামাত্র বজ্রাহত হলো যেন টোয়েন, দীর্ঘক্ষণ অনড় বসে থাকল। তারপর ঘাড় ঘোরাল সে। হাসিমুখে দোরগোড়ায় জাকি হাদাদকে দাঁড়ানো দেখতে পেল। একটা ডেজার্ট ঈগল অটোমেটিক হাতে ধরা। 'প্লীজ, ক্যারি অন,' ইঙ্গিতে কেসটা নির্দেশ করল বেনি পেলেড। 'ওয়ান টু থ্রী ফোর ওটার কম্বিনেশন। নিজেকে যখন সামাল দিতে পারলেই না, তখন খুলে দেখো কি আছে ভেতরে।'

অনেক কষ্টে একটা ঢোঁক গিলল টোয়েন। 'কি আছে!'

'সেটাই তো খুলে দেখতে বলছি। খোলো।'

নড়ল না আলফ্রেড টোয়েন। 'তুমি কি করে টের পেলে আমার আগমন?'

হাসিটা আরও খানিকটা চওড়া হলো পেলেডের। 'তোমার আশেপাশেই ছিলাম আমি, দূরে কোথাও যাইনি। তুমি যে আসবে, আমি জানতাম। কারণ, বার থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই যে তুমি সারাপথ মোটর সাইকেলে ফলো করেছ আমাদের, তা আমি দেখেছি। গাড়িতে যে রিয়ার ভিউ মিরর বলে কিছু একটা থাকে, জানো না?'

'জেনিকে নিয়ে কি করতে চাও তুমি?' আর কি বলবে ভেবে পেল না সে।

'কিছু না,' অটোমেটিকটা দিয়ে আবারও অ্যাটাশে কেসটা নির্দেশ করল পেলেড। 'কি হলো, খুললে না?'

বাঁ হাতে কেসটা কাৎ করে ধরল টোয়েন। আবার একটা ঢোঁক গিলল। অন্য হাতটা ক্যাচের দিকে খানিকটা এগিয়ে থেমে পড়ল মাঝপথে। ঘুরে বেনি পেলেডের দিকে তাকাল সে। হঠাৎ করেই ঘামতে শুরু করেছে দরদর করে।

'বুবি ট্র্যাপের কথা ভাবছ?' বলল পেলেড। 'পাগল! তাহলে আমি এখানে দাঁড়িয়ে খোশগল্প করতাম নাকি তোমার সাথে?'

জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছল আলফ্রেড টোয়েন। তারপর ধীরে ধীরে সংখ্যাগুলো পাশাপাশি সাজাল। আরও খানিকটা ইতস্তত করে ঢাকনা তুলে ফেলল কেসের। ভেতরে টেলিস্কোপসহ একটা রাইফেল খুলে সাজিয়ে রাখা। কেসের মধ্যে ওটার বিভিন্ন অংশের জন্যে ফোম কেটে তৈরি করা ছোট-বড় খাঁজে শুয়ে আছে পার্টগুলো।

'বন্দুক!'

'গ্যালিল স্নাইপিঙ রাইফেল। ইসরায়েলের তৈরি। তাহলে? তোমার

আগ্রহ মিটেছে, মিস্টার জেমস বণ্ড জুনিয়র?'

শেষের বাক্যটা যেন প্রাণ ফিরে পেতে সাহায্য করল আলফ্রেড টোয়েনকে। ঝট্ করে কেসের ভেতর থেকে রাইফেলের খোলা বাঁটটা তুলেই সাজোরে পেলেডের মুখের দিকে ছুঁড়ে মারল সে। এরকম পরিস্থিতিতে ছেলেটির কাছ থেকে এতটা আশঙ্কা করেনি পেলেড ভুলেও। মুখটা ঝটকা মেরে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার আগেই বাঁটের ভারি প্রান্তটা দড়াম করে তার থুতনির ওপর পড়ল। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে।

ডেজার্ট অটোমেটিকটা ধরার জন্যে বানরের মত লাফ দিল এবার টোয়েন। কিন্তু চট্ করে এক পা সরে গেল পেলেড জায়গা ছেড়ে, পাশ থেকে ভয়ঙ্কর এক নক্ আউট পাঞ্চ বসিয়ে দিল তার চোয়ালে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল টোয়েন। এবার সর্বশক্তিতে সবুট লাথি হাঁকল পেলেড ওর পাঁজরে। উড়ে গিয়ে খাটের সঙ্গে বাড়ি খেল টোয়েন, মাথা ঠুকে গেছে। চেষ্টা করেও উঠে বসতে ব্যর্থ হলো যুবক। ঘড়বাড়ি সব দুলছে চোখের সামনে।

এই ফাঁকে চট করে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিল পেলেড অটোমেটিকের নলে। তারপর ডাকল টোয়েনকে। 'এদিকে তাকাও।'

কষ্টেসৃষ্টে হাঁটু গেড়ে বসল ও। মুখ তুলে তাকাল। চেহারা বিকৃত। ভীতিকর শীতল হাসি ফুটল পেলেডের চিকন গোঁফের নিচে। পর পর দুবার ট্রিগার টানল সে আলফ্রেড টোয়েনের ডান চোখ সই করে। বাকি কাজ খুব দ্রুত সারল পেলেড। গায়ের লেদার জ্যাকেট খুলে ওটা দিয়ে যুবকের মাথা মুড়ে দিল। তারপর টানতে টানতে লাশটা পাশের বেডরূমে এনে ঢুকিয়ে দিল খাটের তলায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পরখ করে দেখল পেলেড ওখান থেকে চোখে পড়ে কি না দেহটা। না, পড়ে না। সন্তুষ্ট হলো সে।

বেডরুমে ফিরে গিয়ে চারদিকে ভালমত চোখ বুলিয়ে নিল বেনি পেলেড। ঠিকই আছে। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। অ্যাটাশে কেসটা জায়গামত রেখে ওয়ারড্রোবের পাল্লা আগের মত ভিড়িয়ে দিল। তারপর যেমন এসেছে তেমনি বেরিয়ে গেল।

এবার মোটর সাইকেলটারও বিহিত করতে হয়। এতক্ষণ যেখানে ছিল পেলেড, গাড়ি নিয়ে সেখানে এল আবার। গাড়ি পার্ক করে লক্ করল সে। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে গেল টোয়েনের মোটর সাইকেলের কাছে। উত্তেজনায় চাবিটা খুলে পকেটে রাখার কথাও মনে পড়েনি হয়তো ছেলেটার, বাইকের কী পয়েন্টে ঝুলছে রিঙ।

চাবি ঘুরিয়ে বিএমডব্লিউ স্টার্ট দিল বেনি পেলেড। যেদিকে জেনি গেছে, তার উল্টোদিকে ছোটাল। বিশ মিনিট পর ফিফথ্ অ্যাভিনিউ পৌঁছল সে। খুঁজেপেতে 'পার্কিং' লেখা একটা বোর্ড বের করে ওর নিচে স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে রাখল মোটর সাইকেল। এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত। ট্যাক্সি নিয়ে মারি হিল ফিরে এল পেলেড। গন্তব্য থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। বাকি পথ পায়ে হেঁটে নিজের গাড়ির কাছে এসে পৌঁছল।

স্টেরিও সেটে লায়োনেল রিচির একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে গান শোনায় মন দিল সে। দু ঘণ্টা পুরো হতে এখনও বাকি আছে। তাছাড়া জেনিও নেই। কোথায় গেছে কে জানে। প্রথমে অবশ্য ওকে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল বেনি। কিন্তু পরে যখন লক্ষ করল খালি হাতে বেরিয়েছে, সঙ্গে স্কুল ব্যাগ নেই, তখন বুঝল ধারেকাছেই কোথাও যাচ্ছে। ফিরে আসবে। এসেই পড়েছে কি না এর মধ্যে কে জানে!

কথাটা মনে জাগতেই ক্যাসেট রেকর্ডার বন্ধ করে দিল পেলেড। আর দেরি করে কাজ নেই। বলা যায় না, এসেই পড়েছে হয়তো। ছেলেমানুষ,

হয়তো ম্যাগাজিনে মন বসাতে না পেরে ঘুরঘুর করতে শুরু করে দেবে। যদি ও ঘরের খাটের নিচে··· । অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল বেনি পেলেড।

তেরো

সাবওয়ে ধরে ফিফথ্ অ্যাভিনিউ চলে এল জেনি আরনল্ড। পিযেরিয়া থেকে হ্যাম্ আর মাশরুমের তৈরি দুটো পিয্যা কিনল সাড়ে তিন ডলার খরচ করে। এদের পিয্যা জেনির প্রিয়। আসার পথে একা একা কিছু খাওয়ার সিদ্ধান্ত বাদ দিয়েছে ও। ভেবেছে, তারচেয়ে একসঙ্গে বিকেলের নাশ্তা সারবে ও আর জাকি হাদাদ। নিশ্চয়ই খুশি হবে লোকটা।

খারাপ লাগছে জেনির। কাল সকালে চলে যাচ্ছে হাদাদ। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। ভালই ছিল মানুষটা। দুটো দিন মন্দ কাটল না তার সঙ্গে। কাল থেকে আবার সেই বাসা আর স্কুল, স্কুল আর বাসা। বিরক্তিকর! রোলারকোস্টার মুখোও হওয়া যাবে না আপাতত কয়েকদিন। টোয়েনকে ভাগিয়ে দিয়ে সে পথও নিজেই রুদ্ধ করে দিয়েছে।

কেন যে টোয়েন হাদাদকে ওর মত বন্ধু হিসেবে নিতে পারল না, ভেবে পায় না জেনি। কী এমন মন্দ দেখতে পেয়েছে ও তার মধ্যে? নাকি এ টোয়েনের হীনম্মন্যতা? নাহ্! তা হতে পারে না। কি জানি! আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি, কারও মনের ভাব কি বোঝা সম্ভব? তবে ও যে ভাল ব্যবহার করেনি টোয়েনের সঙ্গে, তা বেশ বুঝতে পারছে। সে যা করেছে,

জেনির ভালর কথা ভেবেই করেছে।

আপনমনে হাঁটছে মেয়েটি। লক্ষই করল না ওর মাত্র কয়েক হাত দূরে পিছন ফিরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জাকি হাদাদ। আলফ্রেড টোয়েনের মোটর সাইকেল পার্ক করে রেখে মারি হিল ফিরে যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সি খুঁজছে। সে-ও অবশ্য দেখেনি জেনিকে।

বাংলোর কাছে এসে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল জেনি আরনল্ড। সামনে হাদাদের গাড়িটা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো ও। পাঁচটা বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল! হলরুমে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা। দরজায় শব্দ হতে চোখ তুলল।

'কখন এলেন আপনি?'

'এই তো, মিনিট দশেক,' মৃদু হাসল বেনি পেলেড। পত্রিকাটা ভাঁজ করে রেখে দিল টেবিলে। 'কিসের প্যাকেট ওটা?' ভুরু নাচাল সে।

'পিয্যা।'

'চমৎকার!' লাফিয়ে উঠে সিধে হয়ে বসল বেনি। থাবা মেরে পত্রিকা ফেলে দিয়ে বাক্সটা রাখার জায়গা করল। 'জলদি নিয়ে এসো। খিদে পেয়ে গেছে। না, দাঁড়াও, কফির জন্যে পানি চড়িয়ে আসি আগে,' বলে দ্রুত কিচেনের দিকে চলল সে। প্রায় তক্ষুণি ফিরে এল একটা রুটি কাটা ছুরি নিয়ে।

পেপার ন্যাপকিনের ওপর রেখে পিয্যা দুটো স্লাইস করতে শুরু করল সে। এই সময় প্যাকেটের গায়ে দোকানের নাম-ঠিকানার ওপর চোখ পড়তে মনে মনে হোঁচট খেল বেনি পেলেড। আপনাআপনি থেমে গেল হাতের কাজ।

'কি হলো?'

'ফিফথ্ অ্যাভিনিউ গিয়েছিলে তুমি?' পূর্ণ দৃষ্টিতে জেনির মুখের দিকে

চেয়ে থাকল বেনি পেলেড। কিছু অনুমান করার চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ। কেন?'

'না, এমনি।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল পেলেড। এক টুক্‌রো পিয্‌যা তুলে নিয়ে জেনিকেও নিতে বলল ইশারায়। বুঝতে পেরেছে, ওকে দেখেনি মেয়েটি ওখানে। দেখে থাকলে সে প্রসঙ্গ এতক্ষণে তুলত নিশ্চয়ই।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেনির। 'জানেন, ওখান থেকে আমার সেই বন্ধুকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'কাকে?' কপাল কুঁচকে উঠল বেনির। মুখের এক ইঞ্চি তফাতে ঝুলছে পিয্‌যার স্লাইস।

'মাসুদ রানাকে।' নিজের স্লাইসে কামড় বসাল জেনি আরনল্ড।

'তারপর?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জেনি। 'কথা বলার সুযোগ পাইনি। অফিসে নেই। খুব ব্যস্ত ও।'

'অ।'

'ভেবেছিলাম রানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাকে। কিন্তু তা আর হলো না।'

'কেন?'

'ও ব্যস্ত, আপনিও কাল চলে যাচ্ছেন। সময় কোথায়?'

'ঠিক আছে। আগামীবার যখন আসব তখন পরিচয় করিয়ে দিয়ো।'

'ফের কবে আসবেন?'

'বলা মুশকিল। তবে...' ডোরবেলের অপ্রত্যাশিত আওয়াজে থেমে গেল বেনি পেলেড। কে হতে পারে? রাইফেল নিয়ে যাওয়ার জন্যে কুরিয়ার পাঠিয়েছে ফ্যালকন? কিন্তু তার তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয়। অন্য কাউকেও আশা করছে না পেলেড। তাহলে? পেপার ন্যাপকিনে হাত

মুছে উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি বোসো। আমি দেখে আসি কে এলো।'

দোরগোড়ায় দুই পুলিস অফিসার দাঁড়ানো দেখে অবাক হলো পেলেড। 'আপনারা?'

'গুড ইভনিং, স্যার,' সম্মান দেখানোর জন্যে ক্যাপ স্পর্শ করল তাদের একজন। 'মিস্টার জাকি হাদাদ?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ। কি ভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

'আমরা ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই,' দরজা পুরো মেলে ধরল বেনি পেলেড।

ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই অফিসার। 'আমি সার্জেন্ট বেইলি,' বলল প্রথমজন। 'আর এ সার্জেন্ট রজার্স।' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল বেইলি। রজার্স একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে পেলেডের মুখের দিকে। পাথরে গড়া মুখ যেন লোকটার, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না।

'আপনাদের আগমনের কারণ কিন্তু এখনও বলেননি, অফিসার,' বেইলির উদ্দেশে বলল পেলেড।

মুখ খুলতে যাচ্ছিল সার্জেন্ট, এই সময়ে জেনি এসে ঢুকল এ ঘরে। পুলিস দেখে চমকে উঠল ও। রজার্সের চোখে পড়ে গেল ব্যাপারটা। দু পা এগোল সে তার দিকে। 'জেনি আরনল্ড?'

ভরসা পাওয়ার আশায় পেলেডের দিকে তাকাল ও আড়চোখে। ভয়ে বড় বড় হয়ে উঠেছে দু চোখ। একটা ঢোক গিলে মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ।'

'আলফ্রেড টোয়েনকে চেনেন আপনি?'

'পলকের জন্যে ভুরু কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল ওর। 'হ্যাঁ, কেন? টোয়েন কি আমার নামে কোন অভিযোগ করেছে আপনাদের কাছে?'

মাথা দোলাল বেইলি এপাশ ওপাশ।

'তাহলে? কিছু হয়েছে ওর?'

'সে প্রশ্নের উত্তর আপনাদের একজনের কাছে পাব আশা করেই এসেছি আমরা,' বলল বেইলি। পকেট থেকে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ বের করে ধীরে সুস্থে ওটার ভাঁজ খুলে মুখের খানিকটা কাছে তুলে ধরল সে। 'মিস্টার টোয়েন টেলিফোন করে একটা মেসেজ দিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে। মেসেজটা এই কাগজে নোট করেছেন তিনি। বলা হয়েছে, মিস জেনি আরনল্ডের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মিস্টার টোয়েন আজ বেলা তিনটেয় আপনাদের অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছেন। সাড়ে চারটের ভেতর যদি তিনি তাঁর কর্মস্থলে ফিরে না যান, তাহলে বিষয়টি পুলিসকে জানানোর জন্যে অনুরোধ করেছেন তিনি বন্ধুকে।' কাগজটা ভাঁজ করে ওদের দুজনের দিকে তাকাল সার্জেন্ট। 'কেমন একটা রহস্যের গন্ধ আছে এর মধ্যে, কি বলেন?'

জোর করে হাসল বেনি পেলেড। বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, অফিসার। এর মধ্যে...'

'মিস্টার হাদাদ,' বাধা দিল ওকে পাথরমুখো রজার্স। 'আপনি জানেন, মিস জেনি নাবালিকা? মাত্র চোদ্দ বছর বয়স, এবং প্যারোলে আছে সে?'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু আমি অন্যায় তো কিছু করিনি, অফিসার। আমরা পরস্পরের বন্ধু।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ফুটল রজার্সের ঠোঁটের কোণে। নজর সরে গিয়ে স্থির হলো জেনির মুখের ওপর। 'কেমন বন্ধু?'

'বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপল মেয়েটি। পলকে টকটকে লাল হয়ে উঠল ওর দুই গাল।

'শান্ত হও, জেনি,' মৃদু চাপড় মারল পেলেড মেয়েটির কাঁধে।

'যাক্‌গে,' বলল সার্জেন্ট বেইলি। 'মিস্টার টোয়েন এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে, মিস্ জেনি?'

'হ্যাঁ। এসেছিল।'

'কেন এসেছিলেন?'

'আমাকে নিয়ে যেতে।'

'কারণ?'

'মিস্টার হাদাদকে বিশ্বাস করতে পারছিল না টোয়েন। আমি এঁর সঙ্গে মেলামেশা করি, তা ওর পছন্দ নয়। তাই নিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'তারপর?'

'আমি যাইনি।' ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেছে জেনি। কি হয়েছে টোয়েনের ভেবে পাচ্ছে না। যদি খারাপ কিছু ঘটে গিয়ে থাকে, যদি এ নিয়ে...।

'মিস্টার টোয়েন ফিরে যান এরপর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'পরে কি আবার এসেছিলেন?'

'আমি জানি না। ও চলে যেতে আমিও বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরেছি এইমাত্র।'

'আপনি দেখেছেন তাকে, মিস্টার হাদাদ?' প্রশ্ন করল রজার্স।

'না। আমিও বাইরে ছিলাম, অফিসার। টোয়েনের সঙ্গে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে আমার, দুবার-ই রোলারকোস্টারে।'

'আপনারা রোলারকোস্টারে খুঁজেছেন ওকে?' জানতে চাইল জেনি।

'সবখানেই খুঁজেছি, মিস্,' চোখ কুঁচকে অন্যমনস্কের মত ওর পায়ের দিকে চেয়ে বলল রজার্স। 'মনে হচ্ছে জলজ্যান্ত একটা মানুষ কর্পূরের মত উবে গেছে। টোয়েনের বন্ধুর মতে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক।'

'ঠিক। কখনও একা থাকে না টোয়েন।' এবার জেনিও সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

'আপনি বলেছেন, মিস্টার হাদাদকে বিশ্বাস করতেন না মিস্টার টোয়েন।' বলল বেইলি। 'কেন?'

'ও আমার অনেকটা বড় ভাইয়ের মত ছিল। নতুন কারও সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলে, সে যদি পুরুষ হয়, তাহলে কড়া নজর রাখত আমার ওপর।'

'মিস্টার হাদাদের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব কিরকম ছিল?'

'ভালো না।'

'যেমন?'

'আমাকে কয়েকবার বলেছে, মিস্টার হাদাদের ভেতর নাকি কিছু একটা গণ্ডগোল আছে।'

'আই সী,' বলল রজার্স। ঠোঁট সরু করে কয়েক মুহূর্ত পেলেডের দিকে চেয়ে থাকল। 'আপনাদের দুজনকে পুলিস স্টেশন যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

'আমাদের কি গ্রেফতার করা হলো?' মুহূর্তে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বেনি পেলেড।

'না। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে আরও।'

মুখ শুকিয়ে গেল জেনির পুলিস স্টেশনের কথা শুনে। ওকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করল পেলেড। 'ভয় পেয়ো না। শুনলে না, গ্রেফতার করা হয়নি আমাদের। এ স্রেফ রুটিন ওঅর্ক, আর কিছু না।' রজার্সের দিকে ফিরল সে। 'বেডরূম থেকে আমার জ্যাকেটটা নিয়ে আসতে পারি?'

'অবশ্যই। চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

বেডরূমের দরজার বাইরে অপেক্ষায় থাকল রজার্স। ভেতরে ঢুকে ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পেলেড। বাঁ দিকের পাল্লাটা খুলল। হ্যাঙ্গার থেকে ধূসর জ্যাকেটটা পাড়ল সে। ওর ভেতরের পকেটে ডেজার্ট ঈগলটা একটু আগেই রেখেছিল পেলেড, ওটা হাতে নিয়ে জ্যাকেটটা তার

ওপর দু ভাঁজ করে ঝুলিয়ে দিল দুদিকে। সাইলেন্সারটা এখনও জোড়া রয়েছে অস্ত্রটার সঙ্গে। ইচ্ছে করেই খোলেনি তখন সে ওটা। দৈর্ঘ্য বেশি হয়ে যাওয়ায় জ্যাকেটটা ভাল করে টেনেটুনে দিল।

কাজটা নিশ্চিন্ত মনে করল বেনি পেলেড। কারণ আগেই দেখে নিয়েছে ওয়ারড্রোবের পাল্লাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত দুটো রজার্সের চোখের আড়াল হয়ে গেছে। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল পেলেড দুটো কারণে। এক, পাল্লাটা বাঁ দিকের হওয়ায় এবং দুই, সাইলেন্সারটা তখন খুলে রাখেনি বলে। দুটোই বড় উপকারে আসবে।

সার্জেন্ট রজার্সকে ওখানেই শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও নিজেকে সামাল দিল বেনি পেলেড। তাতে সতর্ক হয়ে যাবে বেইলি, পরিস্থিতি ওর আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। দুজনকেই একসঙ্গে চাই ওর। ওয়ারড্রোব বন্ধ করে রজার্সের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল পেলেড।

এবার বেইলিকেও আওতায় পাওয়া গেল। কিন্তু ঝামেলা বেধে গেল অন্যখানে। মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনি আরনল্ড, চাইলেই তাকে গুলি করতে পারছে না সে এ-মুহূর্তে।

'চলুন।' ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে ফ্রন্ট ডোরের দিকে পা বাড়াল সার্জেন্ট বেইলি।

হাজার মাইল বেগে চিন্তা করতে লাগল বেনি পেলেড। যা করার দরজা খোলার আগেই করতে হবে। তাতে যদি মেয়েটিকেও হত্যা করতে হয় তা-ও সই। দরজা খুললে সামনের রাস্তা থেকে বাংলোর ভেতরটা দেখা যায় পরিষ্কার। কারও না কারও চোখে পড়ে যেতে পারে ভেতরের গান ফাইট। সে ঝুঁকি কিছুতেই নেয়া চলবে না।

মনস্থির করে ফেলল বেনি পেলেড। ডান হাতটা সামান্য উঁচু করে জ্যাকেটের নিচ থেকে গুলি করল সে রজার্সের মাথা লক্ষ্য করে। হেভি

ক্যালিবার বুলেটের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল সার্জেন্টের খুলি, প্রায় আস্ত মগজটা লাফিয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। দড়াম করে জেনির পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল সার্জেন্ট লাশ হয়ে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল জেনি। বিস্ফারিত চোখ মেলে পেলেডের দিকে তাকাল সে, চাউনিতে রাজ্যের অবিশ্বাস। দরজা খোলার জন্যে নবের দিকে হাত বাড়িয়েছিল সার্জেন্ট বেইলি, পিছনে বিপদ টের পেয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। বাঁ হাতে সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা বোকা মেয়েটিকে জোর ধাক্কায় সরিয়ে দিল সে। অন্য হাতে শোভা পাচ্ছে ভয়ঙ্কর দর্শন কোল্ট পাইথন। পলকে অস্ত্রটা বের করে এনেছে সে হোলস্টার থেকে।

কিন্তু কিছু করার সুযোগ পেল না বেইলি। বুকে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে উড়ে গিয়ে দু হাত পিছনে বন্ধ দরজার ওপর পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল সশব্দে। 'ঠক্' করে ঠুকে গেল মাথাটা। ওই অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত পেলেডের দিকে চেয়ে থাকল সে বিস্মিত দৃষ্টিতে। তারপর হাঁটু ভেঙে গেল বেইলির। দরজায় পিঠ ঘষে ঘষে বসে পড়ল সে ধীরে ধীরে। পুরোপুরি বসে পড়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে তার। নিষ্প্রাণ চোখ দুটো গুলি খাওয়ার মুহূর্তের বিস্ময় তখনও ধরে রেখেছে।

এবার ডেজার্ট ঈগলের ওপর থেকে জ্যাকেট সরাল বেনি পেলেড। ঘুরে জেনির মাথা তাক্ করল। সোফার পাশে দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে আছে মেয়েটি, দু হাতে কান চেপে ধরে রেখেছে। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

'জেনি!'

মুখ তুলল মেয়েটি। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা। অস্ত্রটা ওর দিকেই ধরা আছে দেখে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল জেনির। কাঁদতে কাঁদতে প্রায়

ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে মারবেন না, প্লীজ!'

'ভয় নেই। তোমাকে মারব না,' যথাসম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে বলল পেলেড। 'আমার কাছে তোমার মূল্য অসীম। উঠে দাঁড়াও।'

চোখের পানি মুছে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল জেনি। এসব স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে ওর। না, স্বপ্ন নয়। দুঃস্বপ্ন। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। বাস্তব এত নির্মম হতে পারে না, অসম্ভব।

'টোয়েনের কথা শোনাই উচিত ছিল তোমার, জেনি।'

সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন করল জেনি, 'কি করেছেন আপনি ওর?' মন বলছে ও জানে কী ঘটেছে হতভাগ্য যুবকের কপালে। তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর ফের এসেছিল টোয়েন।'

'তারপর?'

'তালা খুলে ভেতরে ঢুকে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছিল। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই...।'

'খুন করেছেন?'

'উপায় ছিল না।' কাঁধ ঝাঁকাল পেলেড।

চোখের পানি স্রোতের মত বইতে আরম্ভ করল জেনির। মনে হলো কে যেন গুঁড়ো করে দিয়েছে ওর কলজে। টন টন করছে বুকের মধ্যে। কেন শুনল না ও টোয়েনের কথা? ঠিকই বলেছিল ও। উদ্ভট কল্পনার রাজ্যেই এতক্ষণ বাস করছিল জেনি। বন্ধ করে রেখেছিল চোখ। এখন খুলেই দেখছে নির্মম বাস্তব হাঁ করে গিলতে উদ্যত হয়েছে ওকে।

মনে মনে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের অতীত, নিরাপদ জগতে আরেকবার ফিরে যেতে চাইল জেনি মনেপ্রাণে। কিন্তু জানে তা আর সম্ভব নয়। কখনও নয়। নিজেকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হলো জেনির। আলফ্রেড

টোয়েনের মৃত্যুর জন্যে ও-ই দায়ী। ওর জন্যেই ঘটল এসব। টোয়েনের সাবধানবাণী শুনলে এসব কিছুই হতো না।

মুহূর্তে সব আতঙ্ক, ভয় জয় করে ফেলল জেনি আরনল্ড। প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেল। কি হবে বেঁচে থেকে? কি মূল্য আছে এ জীবনের? টোয়েনের মত সে-ও যদি শেষ হয়ে যায় এ মুহূর্তে, কি আসবে-যাবে পৃথিবীর? অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে ভারি কাঁচের অ্যাশট্রেটা তুলে নিয়েই পেলেডের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল জেনি।

নীরবে প্রার্থনা করছে, হে ইশ্বর! আঘাতটা লাগুক ওকে। রেগে উঠুক লোকটা, গুলি করুক আমাকে। কিন্তু কাজ হলো না। জিনিসটাকে উড়ে আসতে দেখে ঝট্ করে নিচু হলো বেনি পেলেড। উড়ে গিয়ে ওপাশের দেয়ালে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল ছাইদানি।

'মাথা গরম করে লাভ নেই, জেনি,' সিধে হয়ে দাঁড়াল লোকটা। রাগের চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়, বরং হাসছে। 'আমার কথা শুনলে কোন ক্ষতি হবে না তোমার।'

চোদ্দ

'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, ভায়া। সময়মত দেখো, রাস্তা পরিষ্কার করে

দিয়েছে লেপার্ড। তারপর অবশ্য ওকেও নিকেশ করতে হবে। সে তো আরও সহজ,' বলল ফ্যালকন। 'তখন আবার নিশ্চিন্তমনে...'

'কিন্তু আমার মন বলছে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে,' বলল ওপ্রান্তের লোকটি। 'তাছাড়া ঠিক সময়ে লেপার্ডও বেয়াড়াপনা শুরু করে দিয়েছে। কথা নেই বার্তা নেই হুট্ করে হ্যাবেন গিয়ে হাজির। আমি ভাবতে পারি না ভুলিকে ব্ল্যাকমেইল করার স্পর্ধা কি করে দেখাল লোকটা!'

'ওর থেকে খরচ করার সুযোগ পাবে না শালা এ জনমে।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু ওর জন্যেই তো মাসুদ রানা জেনে গেল এর সঙ্গে ওর জড়িত থাকার ব্যাপারটা। এটা কতবড় একটা ঝুঁকি ভেবে দেখেছ? হারামজাদাকে বারবার করে বলেছি যেন সময় না হওয়া পর্যন্ত সেফ হাউস থেকে নাক না বের করে। ভয় হচ্ছে, তোমার বুদ্ধিতে শেষ দুটোকে ধরিয়ে দেয়াটা বোধহয় উচিত হয়নি। ম্যাসেগনাকে দিয়েই করানো যেত কাজটা। অনর্থক ঝামেলা জিইয়ে না রেখে এতক্ষণে হয়তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতাম দুজনেই।'

'বুঝতে পারছি তোমার মনটা ভাল নেই আজ। শোনো, দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি বলছি, আমরা যে ভাবে চাইছি, ঠিক সেভাবেই হবে সব। ওদের ধরিয়ে দিয়ে বরং ভালই হয়েছে, খানিকটা হলেও আস্থায় আসা গেছে মাসুদ রানার।'

'কি জানি, ভাই। ওকে আমার ভীষণ ভয়। জানো না তো!'

হেসে উঠল ফ্যালকন। 'জানি জানি। বরং ও-ই জানে না যে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে আগেভাগে জেনে যাচ্ছি আমরা।'

'ওটাই যা ভরসা।'

'তাছাড়া প্রথম থেকেই ও ব্যাটাদের ওপর খুব একটা আস্থা ছিল না আমার। লেপার্ডই ভাল, ঠিক জায়গাতেই বিঁধবে ওর গুলি।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় ও?'

'পড়ুক না। পরের ব্যবস্থা আমি করব,' দৃঢ় স্বরে বলল ফ্যালকন।

কেন? ভুরু কুঁচকে হাতের টাইপ করা কাগজটার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। ইউনাকো টেস্ট সেন্টারের তৈরি করা বিশ্লেষণাত্মক একটা রিপোর্ট ওটা। হোটেল ইউএন প্লাজার বাইরে রামেল নগুয়েনকে হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কিত। সে সময়ে রামেলের অবস্থান, অস্ত্রধারীর অবস্থান পিনপয়েন্ট করে গুলি মিস হওয়ার কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। রুটিন চেক।

টেস্ট সেন্টারের ল্যাব চীফ সিন হেগেনের সঙ্গে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে রানা। কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেনি। মাত্র ত্রিশ ফুট দূর থেকে একজন অ্যাসাসিনের ছোঁড়া গুলি কী করে টার্গেটের তিন ফুট তফাত দিয়ে চলে যায়, ভেবে পায় না মাসুদ রানা।

সিন হেগেনের ক্যালকুলেশন ঠিক ছিল কি না তা নিয়ে মনে সন্দেহ ছিল খানিকটা। টের পেয়ে ওকে সন্দেহমুক্ত করার জন্যে আরও একবার ব্যাপারটা চেক করানো হয়েছে অন্য এক বিশেষজ্ঞ দিয়ে। পরেরবারও ফলাফল একই হয়েছে।

তার মানে হয় ইচ্ছে করেই করেছে কাজটা অস্ত্রধারী, পরে ভেবেছে রানা, নয়ত একেবারেই আনাড়ি ছিল সে। অথবা এ-ও হতে পারে, প্রেস ফটোগ্রাফারদের ধাক্কাধাক্কির ফলে হাত কেঁপে গিয়েছিল তার। নাকি রামেলের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল লোকটা শেষ সময়ে? লক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই টেনে দিয়েছিল ট্রিগার?

এ ছাড়া আর কি হতে পারে, নিজেকে বোঝাল রানা। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীরা কি এ ব্যাপারটি চিন্তা করেনি প্ল্যান করার

সময় যে এমন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে পারে? এর জন্যে কি কোন বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা? কোন ব্যাক আপ? নিয়েছে কি নেয়নি জানতে হলে আরও দু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

দুদিন পর আবার প্রকাশ্যে বের হবেন রামেল নগুয়েন। নিউ জার্সি ট্রেড সেন্টারে মার্কিন শিল্পপতিদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। জিম্বালায় বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাবেন তাদের প্রতি। তার আগের দুদিনের প্রোগ্রাম, আফ্রিকান-আমেরিকান ইনস্টিটিউট সফর এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ, দুটোই রানার অনুরোধে স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছেন রামেল। এই দুদিন নিজেকে হোটেল সুইটে বন্দী রাখবেন তিনি। ওর ত্রিশতলা সীল করে রাখবে স্ট্রাইক ফোর্স—বিশেষ কারণে।

লম্বা করে হাই তুলল মাসুদ রানা। বিকেল চারটা। ক্লান্তি লাগছে বসে থাকতে থাকতে। এখনও কোন খবর নেই প্রেসিডেন্ট রামেলের। বৈঠক শেষ হলে এখানে ফোন করার কথা আছে তাঁর। অবাক হয়ে ভাবল রানা, তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও শেষ হয়নি বৈঠক? নাকি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে খার্তুম? ব্যর্থ হয়েছে বৈঠক?

অস্থিরতা পেয়ে বসল ওকে। কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে জেনির কথা মনে পড়ল। চট্ করে রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাল ও, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো যাক কিছুক্ষণ। আগামী দুদিন হয়তো সুযোগ হবে না। হয়তো। রিঙ হচ্ছে ওপ্রান্তে। একবার···দুবার···চারবার। ধরছে না জেনি। ব্যাপার কি! ভুরু কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার।

এই সময় ওকে চমকে দিয়ে টেবিলের লাল টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাতেরটা রেখে ওটার রিসিভার তুলল ও দ্রুত। 'হ্যালো!'

'রামেল।'

'ইয়েস. স্যার?' রিসিভার কানের সঙ্গে চেপে ধরল রানা। উত্তেজনায়

কাঁপতে শুরু করেছে হাত।

'বৈঠক সফল।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি আসছি।'

সাড়ে চারটেয় রামেল নগুয়েনের হোটেল সুইটে বসল আরেক মীটিং। ইউনাকো প্রধান উপ-প্রধান, স্ট্রাইক ফোর্স উপ-প্রধান, রামেল নগুয়েন, জাতিসংঘের সুদানের রাষ্ট্রদূত এবং মাসুদ রানার উপস্থিতিতে। টানা দু ঘণ্টা স্থায়ী হলো মীটিং।

সন্ধে সোয়া সাতটায় নিউ জার্সির নিউ আর্ক এয়ারপোর্ট থেকে রানাকে নিয়ে শূন্যে ডানা মেলল ইউনাকোর বিশেষ বিমান। কন্ট্রোল টাওয়ার জানে ওটার গন্তব্য ওয়াশিংটন। আসলে জিম্বালার নিকটবর্তী সুদানের সীমান্ত শহর এল মাশের। কিন্তু আধঘণ্টা পর চমকে উঠল নিউ আর্ক কন্ট্রোল টাওয়ার। পরপর দুবার মে-ডে পাঠাল বিমানটির ব্রিটিশ পাইলট, তারপর উধাও হয়ে গেল রাডার থেকে।

রাত আটটা। বাসায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত কর্নেল মাইকেল ফিশার। পাশের রুমে লিওনিদ কলচিনস্কিও প্রস্তুত। সাধারণত এক সঙ্গেই অফিস ত্যাগ করেন ওঁরা দুজন। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কোটটা পরলেন ফিশার। তারপর ছড়ির জন্যে হাত বাড়ালেন।

বাধা দিল টেলিফোন। 'মিস্টার ফিশার?'

নিউ ইয়র্ক পুলিসের ডেপুটি কমিশনার নোভাক হ্যালির কণ্ঠ শুনে বেশ অবাক হলেন তিনি। 'হ্যালি, কি ব্যাপার?'

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন কমিশনার। 'আপনি এক্ষুণি একবার মারি হিল আসুন। খুব জরুরী।'

শক্ত হয়ে গেলেন কর্নেল। 'কেন?' প্রায় চার্জ করে বসলেন তাকে।

'টেলিফোনে বলা যাবে না। ব্যাপারটা আপনার নাতনী সম্পর্কিত। দেরি করবেন না। হারি আপ, প্লীজ।'

কড়া গলায় মিলিটারি ধমক লাগালেন এবার ফিশার। 'কেন হেঁয়ালি করছ! কি হয়েছে ওর?'

'আমরা শিওর নই। এখানে এক বাংলোয় তিনটে মৃতদেহ উদ্ধার করেছি আমরা এইমাত্র। দুজন পুলিস, একজন সিভিলিয়ান। জেনির স্কুলব্যাগও পাওয়া গেছে...'

'ও মাই গড!' আঁতকে উঠলেন মাইকেল ফিশার। 'জেনি...জেনি কোথায়?'

'জানি না। ওকে পাওয়া যায়নি।'

'বাংলোটা কার, হ্যালি?'

'জানতে পারিনি এখনও। চলে আসুন। একশো সাঁইত্রিশ নাম্বার বাংলো। রাখছি।' ফিশারকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন কমিশনার।

'কি হয়েছে, মাইকেল?' পিছন থেকে কলচিনস্কির গলা শুনে ঘুরে তাকালেন হতচকিত কর্নেল। মাঝখানের দরজা খোলাই ছিল। কলচিনস্কির এ রুমে আসা টের পাননি।

'অ্যাঁ?' আহম্মকের মত বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকলেন তিনি।

'কি হয়েছে? কার টেলিফোন?'

এতক্ষণে রিসিভার রাখার কথা খেয়াল হলো কর্নেলের। ওটা রেখে কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছলেন ফিশার। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, লিওনিদ।'

'মানে?'

ছড়ির জন্যে হাত বাড়ালেন কর্নেল। খুব সংক্ষেপে নোভাক হ্যালির

বক্তব্য জানালেন ব্রিগেডিয়ারকে। 'আমি যাচ্ছি ওখানে। তুমি...'

'চলো, আমিও যাব।'

পনেরো মিনিট লাগল মারি হিল ডিস্ট্রিক্ট পৌঁছতে। সারা পথ কোন কথা হয়নি দুজনের। দূর থেকে অসংখ্য পুলিস কারের ফ্ল্যাশ দেখে গতি কমাল ড্রাইভার। তিনটে অ্যাম্বুলেন্সও আছে ওর মধ্যে। বাংলোর সামনের রাস্তা ব্লক করে রেখেছে পুলিস ফিতে টাঙিয়ে। ওর বাইরে জনতার উপ্‌চে পড়া ভিড়। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে পত্রিকা টিভির সাংবাদিক-আলোকচিত্র শিল্পী। সবাই জেনে গেছে তিনটে মৃতদেহ পাওয়া গেছে বাংলোর ভেতর।

গাড়ি থেমে দাঁড়াতে দ্রুত নেমে পড়লেন ফিশার ও লিওনিদ। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল এক সার্জেন্ট। নিঃশব্দে ফিতে তুলে ধরে ভেতরে ঢুকে পড়তে আনুরোধ করল।

'নোভাক হ্যালি কোথায়?' নিজের অস্বাভাবিক ফ্যাঁসফেঁসে গলা শুনে নিজেই অবাক হলেন কর্নেল। টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকেই ঘামছেন তিনি। ঠাণ্ডা আঠাল ঘামে চিট্ চিট্ করছে সারা গা, মুখ-কপাল। রুমাল বের করে মুখ মুছলেন তিনি।

'বাংলোর ভেতরে আছেন, স্যার,' বলল অফিসার। 'সোজা চলে যান।'

ব্যস্ত হয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন ফিশার, পিছন থেকে তাঁর বাহু আঁকড়ে ধরলেন কলচিনস্কি। 'অত উতলা হচ্ছ কেন?' ভেতরে ভেতরে তিনি নিজেই উতলা। তবু যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললেন। 'আস্তে হাঁটো।'

ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন দুই বৃদ্ধ। চোখের সামনে পড়ে আছে রজার্স আর বেইলির নিথর দেহ। রক্তে ভেসে গেছে পুরো ফ্লোর। জমাট

বেঁধে থক থক করছে কালচে রক্ত। রুমের ও মাথায় খোলা দরজার ওপাশে একটা বেডরুম মত দেখা যাচ্ছে। ওখানে রয়েছে তৃতীয় লাশটা।

'কর্নেল, কেমন আছেন?' ওঁদের দিকে এগিয়ে এলেন ডেপুটি কমিশনার নোভাক হ্যালি। কলচিনস্কির সমান লম্বা হবেন ভদ্রলোক। কিন্তু ভীষণ মোটা। গলার নিচে দু ভাঁজ খেয়ে বিচ্ছিরি ভাবে ঝুলে আছে চামড়া। ইউনিফর্মের চওড়া বেল্ট ঠেলে আধ হাত বেরিয়ে আছে প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। বাদামী চুল। ঘাড়-গর্দানের চিহ্নমাত্র নেই। মাথাটা যেন একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল, চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁধের ওপর। বয়স পঞ্চাশের মত। প্রথম দৃষ্টিতেই লোকটিকে অপছন্দ হলো লিওনিদ কলচিনস্কির। টের পেলেন, মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হয় না এ লোক, হয় ইন্দ্রিয় দ্বারা।

তার বাড়ানো হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন ফিশার। 'হ্যালি, ইনি লিওনিদ কলচিনস্কি। ডেপুটি চীফ, ইউন্যাকো।'

'প্লীজড্ টু মিট ইউ, স্যার।' তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন এবার কমিশনার। 'চলুন, ওখানে বসা যাক,' ইঙ্গিতে সোফা দেখালেন তিনি।

বসেই জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, 'কি ঘটেছে, হ্যালি?'

প্রথমে দুই হাতের তালু ডললেন কমিশনার, ঘষে ঘষে মুখ মুছলেন। তারপর আলফ্রেড টোয়েনের তার বন্ধুকে টেলিফোন করা থেকে বলতে আরম্ভ করলেন।

'এরা খুঁজতে এসেছিল টোয়েনকে?' তিনি থামতে প্রশ্ন করলেন কলচিনস্কি।

মাথা দোলালেন নোভাক হ্যালি। কয়েক মুহূর্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন লাশ দুটোর দিকে। 'অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে এদের, মিস্টার কলচিনস্কি। আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পায়নি কেউ। এরা দুজনেই

বিবাহিত, ছেলে-মেয়ের বাপ,' জ্বলন্ত চোখে মাইকেল ফিশারের দিকে তাকালেন তিনি। 'এদের যে হত্যা করেছে, তাকে গ্যাস চেম্বারে না ঢোকানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না আমি।'

'তুমি ভাবছ জেনি হত্যা করেছে ওদের?' পাল্টা মেজাজ দেখালেন বৃদ্ধ। 'একটা চোদ্দ বছরের নাবালিকা?'

'ফিশার, শান্ত হও,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন কলচিনস্কি। 'উত্তেজিত হয়ো না।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কমিশনারের দিকে তাকালেন। 'সত্যিই কি...'

'না। এ কাজ জেনির নয়। এর পিছনে কোন প্রফেশন্যালের হাত রয়েছে।'

'অন্য লাশটি কার, টোয়েনের?' ইঙ্গিতে বেডরুমের দেহটা দেখালেন কলচিনস্কি।

'হ্যাঁ। ছেলেটি জেনির বন্ধু। এদের অন্তত এক ঘণ্টা আগে হত্যা করা হয়েছে ছেলেটিকে। মৃতদেহটা পাওয়া গেছে ওই খাটের নিচে।'

'কোনও ফিঙ্গার প্রিন্ট?'

'হ্যাঁ,' ফুটবল দোলালেন কমিশনার। 'কয়েক সেট পাওয়া গেছে। তবে...সবগুলোই জেনির। আমাদের এক্সপার্টরা অবশ্য হাল ছাড়েনি এখনও। দেখা যাক, কি হয়।'

'যদি আমাদের কোন সাহায্য...'

'না!' প্রায় অভদ্রের মত কলচিনস্কিকে বাধা দিলেন কমিশনার। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন নিজেকে। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার কলচিনস্কি। থ্যাঙ্ক ইউ এনিওয়ে। এ আমরাই করতে পারব।'

'আর কোন সূত্র পাওয়া যায়নি?' প্রশ্ন করলেন ফিশার। আশ্চর্যরকম ফ্যাকাসে লাগছে তাঁকে।

'পাশের বাংলোর এক মহিলা জানিয়েছেন, আড়াইটা পৌনে তিনটের দিকে সবুজ একটা ফিয়াটে চড়ে এখানে আসে আপনার নাতনী এবং এক লোক। লোকটির চেহারা চিনতে পারেননি মহিলা। সান গ্লাস ছিল তার চোখে, পরনে ছিল কালো লেদার জ্যাকেট। জ্যাকেটের ল্যাপেল তোলা ছিল বলে মুখ দেখা যায়নি। এছাড়া আর কিছু জানা যায়নি। এ কারণেই আমি ভাবছি কাজটা প্রফেশন্যালের, যার তার নয়। হতে পারে লোকটা কোন ড্রাগ র‍্যাকেটের হিটম্যান, কে জানে? জেনিও তো ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল। ছিল না?'

কাগজের মত সাদা হয়ে গেল বৃদ্ধের মুখ। প্রচণ্ড রাগে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে সারাদেহ। 'ছিল, হ্যালি। এখন আর নেই। মাই গড্, এমনভাবে বলছ তুমি...।' থেমে গিয়ে তোতলাতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে।

'ড্রাগের মায়া বড় মায়া,' দার্শনিকের মত ফুটবল দোলাতে লাগলেন কমিশনার। 'ড্রাগ ইজ ড্রাগ!'

খেপে উঠলেন এবার কলচিনস্কি। 'ব্যান নিকোটিন আর অ্যালকোহলও তাই, মিস্টার হ্যালি।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। এ দুটোর প্রতি ডেপুটি কমিশনারের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামাল দিলেন তিনি। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন। 'দুঃখিত, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। প্রেস কনফারেন্স আছে। চলে যান আপনারা। কোন নতুন খবর হলে ফোন করব আমি।' ঘুরে দাঁড়ালেন কমিশনার। দুম দুম পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় চোখের কোণে সাদামত কিছু একটা ধরা পড়ল কলচিনস্কির। একটা পেপার ন্যাপকিন।

পড়ে আছে সেন্টার টেবিলের নিচের তাকে রাখা ম্যাগাজিনের ওপর। হাত বাড়ালেন তিনি। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চট্ করে পকেটে পুরলেন ওটা।

'চলো যাই,' ফিশারের বাহু ধরে টান দিলেন তিনি। 'এখানে কিছু করার নেই আমাদের।'

ওঠার লক্ষণ নেই তাঁর। বসে আছেন গ্যাঁট হয়ে। 'কিন্তু... লোকটা যদি জেনিকেও...'

'সেরকম সম্ভাবনা খুব কম। ওকে যদি হত্যা করার ইচ্ছে থাকত তাহলে এখানে এদের সাথেই মেরে রেখে যেতে পারত হত্যাকারী। তা যখন করেনি তখন বেঁচে আছে জেনি, আশা করি। চলো তো!' হঠাৎ করেই ফিশারের মুখের ওপর চোখ পড়ল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'এতো ফ্যাকাসে লাগছে কেন তোমাকে, মাইক? তুমি সুস্থ আছ তো?'

'আমি...আমার...।' টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। দুর্বল হাতে কপালের ঘাম মুছতে চাইলেন, কিন্তু নড়ছে না হাত। আচমকা বিস্ফারিত হয়ে উঠল দু চোখ। 'আমাকে ধরো!' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ।

বুকের ভেতর আচমকা মুগুরের বাড়ি পড়ল যেন ফিশারের। পলকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঘাড় চোয়াল এবং বাহুর মাংসপেশী। ছড়ি ছুটে গেল ফিশারের হাত থেকে। দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে বুকের ভেতর। বাঁ হাতে বুক খামচে ধরে অন্ধের মত হাত বাড়ালেন তিনি সামনের দিকে, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা।

বুঝে ফেললেন কলচিনস্কি কি ঘটছে। দু হাতে বন্ধুকে আঁকড়ে ধরে সাহায্যের জন্যে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। অসহ্য ব্যথায় চোখে পানি এসে গেছে কর্নেলের। ক্রমেই আরও বাড়ছে ব্যথা। সাবধানে তাঁকে সোফায় শুইয়ে দিলেন কলচিনস্কি। হার্ট অ্যাটাকের ফার্স্ট এইড সম্পর্কে কেজিবিতে

থাকতে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাঁকে। জানেন, এ মুহূর্তে রোগীকে যতটা শান্ত এবং উষ্ণ রাখা যায়, ততই মঙ্গল। চট্ করে নিজের কোটটা খুলে ফেললেন তিনি, ওটা দিয়ে ঢেকে দিলেন ফিশারের বুক।

ওর মধ্যেও কিছু বলতে চাইছেন যেন কর্নেল। বারবার চেষ্টা করছেন মুখ খুলতে। কিন্তু পারছেন না। মনে হচ্ছে শিয়রে মৃত্যু উপস্থিত। মারা যেতে বসেছেন মাইকেল ফিশার। এ মুহূর্তে মৃত্যু হলে বরং বেঁচেই যেতেন তিনি। অন্তত অকল্পনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

দোরগোড়ায় পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকালেন কলচিনস্কি। এক সার্জেন্টকে দেখা গেল, থতমত খাওয়া দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এদিকে। 'ডেপুটি কমিশনারকে ডাকুন!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। 'জলদি! হার্ট অ্যাটাক করেছে কর্নেলের। অ্যাম্বুলেন্স দরকার।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সার্জেন্ট, তারপর ঘুরেই দুদ্দাড় ছুটল।

'ভয় নেই, মাইক,' যত্নের সঙ্গে তাঁর কপালের ঘাম মুছে দিলেন কলচিনস্কি। মৃদু গলায় বললেন, 'কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।' বন্ধুর কষ্ট অনুভব করে তাঁর চোখেও পানি এসে গেছে।

কয়েক মিনিট পর টের পেলেন কর্নেল, ব্যথা কমতে শুরু করেছে হঠাৎ করেই। তার বদলে চেপে আসতে শুরু করেছে বুক। যেন বড় সাঁড়াশি দিয়ে আঁকড়ে ধরে ক্রমেই চাপ বাড়িয়ে চলেছে কেউ ওখানটায়। শীত লাগছে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা ঘাম গড়াতে শুরু করল সারা গা বেয়ে। এইবার বুঝলেন ফিশার কী ঘটেছে। তাঁর পিতাও দুবার এ রোগের শিকার হয়েছিলেন। লক্ষণটা পরিষ্কার মনে আছে। ডাক্তারি ভাষায় একে বলে করোনারি থ্রম্বসিস্। প্রায় সুস্থ মনে হচ্ছে এখন নিজেকে তাঁর। যদিও কথা বলতে পারছেন না।

বন্ধুকে দরদর করে ঘামতে দেখে আশ্বস্ত হলেন কলচিনস্কি। ঘাম মুছতে

মুহূর্তে বললেন, 'আর ভয় নেই, মাইক। বিপদ কেটে গেছে। আর ভয় নেই।'

বাংলো কাঁপিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এই সময় নোভাক হ্যালি। হাঁপাচ্ছেন ফোঁস ফোঁস করে। পিছনে সাদা গাউন পরা তিন-চারজন মেডিক। স্ট্রেচার নিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দুই মিনিটের মধ্যে বেলভিউ হাসপাতালের উদ্দেশে ছুটল অ্যাম্বুলেন্স সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজে চারদিক সচকিত করে।

দশটা। মাইকেল ফিশারের আসনে ধ্যানমগ্নের মত বসে আছেন লিওনিদ কলচিনস্কি। তাঁর অনুপস্থিতির কারণে ইউনাকো প্রধানের দায়িত্ব পদাধিকার বলে কলচিনস্কির ওপরই বর্তেছে। কর্নেলকে হাসপাতালে ভর্তি করে মিনিট পনেরো আগে ফিরেছেন। পেপার ন্যাপকিনে দ্বিতীয় কারও হাতের ছাপ পাওয়া যায় কি না জানার আশায়। ল্যাবের নাইট শিফট-ইন-চার্জের হাতে ওটা তুলে দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন।

কিন্তু বুড়ো হাড়ে আর কুলোচ্ছে না। মন চাইছে এখানেই কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়া গেলে ভাল হত। কিন্তু পারছেন না। জেনি ফিশারের কত আপন, জানা আছে তাঁর। এবার ভাগ্যগুণে বেঁচে উঠলেও মেয়েটির যদি খারাপ কিছু ঘটে, কোনমতেই বাঁচানো যাবে না ফিশারকে, এ-ও অনুমান করতে পারেন তিনি।

এরকম জটিল মুহূর্তে সামান্য এক পেপার ন্যাপকিনকেও ছোট করে দেখার উপায় নেই। কে বলতে পারে ওতে হত্যাকারীর ছাপ নেই। এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভাল হত যদি মাসুদ রানা থাকত। লাফ ঝাঁপের হাত থেকে বেঁচে যেতেন কলচিনস্কি। ব্যাপারটা যদি ও নিউ ইয়র্ক থাকতে...।

মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে লম্বা হাই তুললেন তিনি। ঘুমে বুজে আসছে চোখ। উঠে পিছনের ডিসপেনসার থেকে এক কাপ কালো কফি ঢাললেন। ফিরে এসে গা এলিয়ে বসে পড়লেন বৃদ্ধ চেয়ারে। চুমুক দিলেন কফিতে। পেটে গরম পানীয় পড়তে মাথা খানিকটা হালকা হলো যেন। আবার চুমুক দিতে গেলেন। এই সময় দরজায় নক হলো।

'কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকল তরুণ এক অ্যানালিস্ট। হাতে একটা ফোল্ডার। ওটা দেখেই অল্প অল্প হাত কাঁপতে শুরু করল বৃদ্ধের। না জানি কি আছে ওতে। আছে তো কারও হাতের ছাপ? কার, জেনির? না আর কারও? কাপ রেখে নির্বিকার মুখে সিগারেট বের করলেন কলচিনস্কি। ইশারায় বসতে বললেন তাকে। লম্বা টানে বুক ভরে ধোঁয়া নিয়ে একটু একটু করে ছাড়তে লাগলেন। যেন কোন ব্যস্ততা নেই। অথচ ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট করছেন ফলাফল জানার আশায়। 'কিছু পেলে, লুকাস?'

'পেয়েছি, স্যার।' ফোল্ডারটা কলচিনস্কির দিকে বাড়িয়ে ধরল অ্যানালিস্ট।

নিলেন ওটা তিনি। কভার উল্টে ভেতরে একটা কম্পিউটর প্রিন্ট আউট দেখতে পেলেন। প্রথমেই বড় অক্ষরে লেখা একটি নামঃ বেনি পেলেড। নিচে কয়েক সেট আঙুলের ছাপ। মন্ত্রমুগ্ধের মত ঝাড়া দুই মিনিট নামটার দিকে চেয়ে থাকলেন ব্রিগেডিয়ার। তারপর আস্তে করে বন্ধ করলেন ফোল্ডার। 'ধন্যবাদ, লুকাস। তুমি যেতে পারো।'

ছেলেটি বেরিয়ে যেতে আবার ফোল্ডার খুললেন তিনি। বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠে গেছে। ভয়ের! আতঙ্কের! না, তাও নয়। আসলে অনুভূতিটা ব্যাখ্যা করতে পারছেন না কলচিনস্কি। এই খবরে যতটা চমকানো উচিত

ছিল, ততটা চমকাননি তিনি। বরং তাঁর অবচেতন মন যেন এমনই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিল। তাই কি?

ফোল্ডারের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে কাপটা ধরার জন্যে অনুমানে হাত বাড়ালেন উপ-প্রধান। কিন্তু হাতের বাইরের দিকে ধাক্কা লেগে ঝপ্ করে পড়ে গেল ওটা। বিরক্ত হয়ে নিজেকে গালমন্দ করলেন বৃদ্ধ, উবু হয়ে কাপটা তুলতে গেলেন। এই সময় চোখের কোণে টেবিলের নিচে সাঁটা কালোমত একটা কিছুর আভাস ধরা পড়ল।

নিশ্চয়ই মাকড়সা, প্রথমে ভাবলেন কলচিনস্কি। আর নয়ত...আরেকটু ঝুঁকে ভাল করে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করলেন। বিষাক্ত বিছে কামড়ালে কেমন লাগে জানেন না তিনি, অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু জিনিসটা চেনামাত্র অনেকটা যেন সেরকমই অনুভূতি হলো তাঁর। ঝিন্ করে উঠল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

ওটা একটা মাইক্রোফোন। কোটের বোতামের মত আকার, গোল। দুটো প্রঙ আছে পিঠের দিকে, কাঠের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে। অস্বাভাবিক স্থির দৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকলেন কলচিনস্কি। দেখে মনে হয় দম নিতেও ভুলে গেছেন। যেখানে আছে সেখানেই থাকুক জিনিসটা, ভাবলেন তিনি।

সরাতে গেলে, যে জিনিসটা এখানে প্ল্যান্ট করেছে, তাকে সতর্ক করে দেয়া হবে। কাজটা কে করেছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তাঁর। এমন কাজ করার একজনই আছে ইউনাকোয়। ডি আর্চি। সিনিয়র ইলেক্ট্রোনিক এক্সপার্ট। নিজহাতে না করলেও ব্যাপারটা তার অজানা থাকতে পারে না কিছুতেই। কারণ প্রতিদিন সকালে এই জিনিসের খোঁজে একবার করে প্রতিটি অফিস সার্চ করার দায়িত্ব তার। ডি আর্চি জানে না, এ হতেই পারে

না।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন লিওনিদ কলচিনস্কি। প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকলেন নিজের রুমে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। তার টেবিলের সঙ্গেও জোড়া আছে একটা। একই জিনিস। সর্বনাশ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার। কতদিন থেকে এ খেলা চলছে ইউনাকোয়? অনেক আগেই বসানো হয়েছে এগুলো? নাকি সম্প্রতি?

যদি সম্প্রতি হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে প্রেসিডেন্ট নগুয়েনের ব্যাপারে···আরেকটা ব্যাপার খেয়াল হতে আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ। মাসুদ রানার গোপন যাত্রা কি তাহলে ফাঁস হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই ফাঁস হয়ে গেছে। তার মানে, ওকে ঠেকানোর জন্যে এল মাশের সংলগ্ন জিম্বালান বর্ডারে অপেক্ষা করবে জা ভুলির রিসেপশন পার্টি? কারণ আজ দুপুরের পরপরই হ্যাবেন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মাসুদ রানা। এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে মাইকেল ফিশারের রুমে।

কপালের কাছের চুল মুঠো করে ধরে বসে থাকলেন ব্রিগেডিয়ার। কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

'সামনে একটা রোডব্লক!' বিস্মিত হলো ট্যাক্সি ড্রাইভার। 'আশ্চর্য! এদিকে রোডব্লক কেন?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল সে।

পিছনের আসনে সিধে হয়ে বসল মাসুদ রানা। ঝুঁকে গাড়ির আলোয় সামনে দেখার চেষ্টা করল। স্থানীয় সময় সন্ধে আটটা। সুদান-জিম্বালা বর্ডার অতিক্রম করেছে রানা সাংবাদিক পরিচয়ে, দশদিনের ভিসা নিয়ে। বর্ডার পেরিয়ে মাত্র ঘণ্টাখানেক এগিয়েছে ওর ভাড়া করা ট্যাক্সি। এই সময়

বাধা। হ্যাবের এখনও অনেক দূর।

পথের পাশে দুটো আর্মি জীপ দাঁড়ানো দেখা গেল। জিম্বালান আর্মির টিউনিক পরা সৈনিকদের ছোটখাট এক জটলা। থেমে দাঁড়াল ট্যাক্সি। জানালার কাছে এসে সরাসরি রানার চোখের ওপর টর্চ মারল এক অফিসার। হাত তুলে চোখ আড়াল করার চেষ্টা করল ও। লোকটির কাঁধের ব্যাজে চোখ বোলাল। মেজর।

'আপনার পাসপোর্ট?' ইংরেজিতে গম্ভীর কণ্ঠে বলল মেজর।

হাত বাড়িয়ে পাসপোর্ট দিল মাসুদ রানা। ওটার ওপর টর্চের আলো ফেলল মেজর। নাম-ঠিকানা পড়ল, ছবির ওপর চোখ বোলাল। তারপর আরও গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'নেমে আসুন গাড়ি থেকে।'

'সমস্যাটা কি, অফিসার?' যথাসম্ভব অবিচলিত থাকার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। যদিও বুঝতে পারছে কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

'যা বলছি তাই করুন,' দাবড়ি লাগাল মেজর। 'বেরিয়ে আসুন!'

কোন উপায় নেই, ভাবল মাসুদ রানা। এর ফাঁকে গুণে দেখেছে ওরা মোট সাতজন। একজনই অফিসার, এই মেজর। এ ছাড়া আর সবার হাতে একটা করে মিনি উজি রয়েছে। তেড়িবেড়ি করার কোন উপায় নেই। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ও।

'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

বেকুবের মত মেজরের মুখের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'আমার অপরাধ?'

'আমাদের হেড অফিসে গেলে জানতে পারবেন তা। চলুন,' ইশারায় অপেক্ষমাণ দুই জীপের একটা নির্দেশ করল মেজর।

'বিনা কারণে একজন বিদেশী সাংবাদিককে গ্রেফতার করছেন আপনি,

অফিসার,' কঠিন কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি জানেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেস...'

'না, জানি না। জানতে চাইও না। হয় ভালয় ভালয় জীপে উঠুন, না হলে হাতকড়া পরাতে বাধ্য হব আমি। বেছে নিন যেটা খুশি।'

অসহায়ের মত কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে উঠে বসল গিয়ে নির্দেশিত জীপের সামনের আসনের মাঝখানে। এ পাশে ড্রাইভার, অন্য পাশে উঠে বসল মেজর। রওনা হয়ে গেল জীপ।

মিনিট দুয়েক চলার পর বলে উঠল অফিসার, 'ইচ্ছে হলে ধূমপান করতে পারেন আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

চমকে উঠল রানা। শক্ত হয়ে গেছে দেহের প্রতিটি পেশী। কিন্তু ভাবটা বহুকষ্টে চেপে রাখল ও।

'দিলাম তো ঘাবড়ে?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মেজরের।

'কে আপনি?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না ও।

'অধমের নাম মেজর কলওয়েজি। থুড়ি, মেজর না। আমি ক্যাপ্টেন।'

'কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাকে?'

'কোনডেসি।'

'কোনডেসি!'

'হ্যাঁ,' হাসিটা সারা গালে ছড়িয়ে পড়ল কলওয়েজির। 'ওখানে আপনার সাক্ষাৎ লাভের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জিম্বালার ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট, জা ভুলি।'

পনেরো

মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম ভাঙল জেনি আরনল্ডের। একটা সিঙ্গেল বেডে শুয়ে আছে ও। রুমটা ছোট। খাট ছাড়া একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার আর একটা আর্মচেয়ার আছে রুমে। খাটের পায়ের কাছে একমাত্র জানালা ঘেঁষে একটা হ্যাণ্ড বেসিনও আছে। পর্দা টানা রয়েছে জানালার। সামান্য নড়াচড়া করতেই প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দশা। এখানে কেন আমি? ভাবল ও।

মুখ চোখ বিকৃত করে উঠে বসল জেনি অনেক কষ্টে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে দু হাতে মুখ ঢাকল। এই সময় ক্লোরোফর্মের গন্ধ পেল ও। পরনের কাপড় থেকে আসছে গন্ধটা। পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল সব। জাকি হাদাদের হাতে দুই পুলিসের মৃত্যু, তারও আগে আলফ্রেড টোয়েনের···তারপর মাথার পিছনদিকে···।

ওর ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরে আসে জেনির। চোখ মেলেই লোকটিকে দেখতে পায় ও, দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। সে মুহূর্তে লোকটার চেহারায় সামান্য উদ্বেগও যেন ছিল। হাতে অটোমেটিক ডেজার্ট ঈগল। চোখ ঘোরাতে পায়ের কাছে একটা অ্যাটাশে কেস এবং একটা হোল্ড অল দেখতে পায় জেনি।

এই সময় কালো চামড়ার এক লোক ঘরে ঢুকল। লোকটির সঙ্গে

অজানা এক ভাষায় বাক্য বিনিময় হয় হাদাদের। এ ভাষা আগে কখনও শোনেনি জেনি। আলাপ সেরে ওকে নির্দেশ দেয় হাদাদ, তার পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে জেনিকে। সে সময় যদি চেঁচিয়ে বা অন্য আর কোন উপায়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে তাকে।

বিনা বাক্য ব্যয়ে লোকটির নির্দেশ পালন করে সে। কারের ব্যাক সীটে উঠে বসামাত্র কালো চামড়ার লোকটি ক্লোরোফর্ম ভেজা রুমাল ঠেসে ধরে জেনির নাকের ওপর। এরপর আবার অন্ধকারে তলিয়ে যায় জেনি আরনল্ড। দ্বিতীয়বার কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল জানে না ও। আঘাতের ফলে মাথার পিছনে টিউমারের মত উঁচু হয়ে থাকা জায়গায়টায় আলতো করে হাত বোলাল জেনি। টন্ টন্ করছে যন্ত্রণায়।

ক'টা বাজে এখন? নিশ্চয়ই অনেক রাত। জেনি যখন বাংলো থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠে, তখন সবে সন্ধে হয়েছে। বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও, হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। কয়েক মুহূর্ত বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থাকল। তালা মারা? কাছে গিয়ে নব ধরে টান দিল জেনি। ঘুরল না নব্, তালা মারা।

এবার জানালার দিকে এগোল জেনি। পর্দা সরিয়ে শাটার ধরে ঠেলা দিল ওপরদিকে। নড়ল না শাটার। আবার চেষ্টা করল জেনি। তেমনি অনড় শাটার, এক চুলও উঠল না। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ও একটা কিছুর খোঁজে, যা দিয়ে কাঁচ ভাঙা যায়। কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই। চেস্ট অভ ড্রয়ারের চারটে ড্রয়ারই খুলে দেখল জেনি, সবগুলো ফাঁকা। হতাশ হয়ে বিছানায় ফিরে এল ও। ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজার তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ পেল জেনি।

পরমুহূর্তে খুলে গেল এক পাল্লার দরজাটা। বেনি পেলেড দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। ভেতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল সে। দৃঢ়, মাপা পায়ে হেঁটে এসে বসল আর্ম চেয়ারে।

'আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন?' জোর করে গলায় কাঠিন্য ফোটাবার চেষ্টা করল জেনি।

'নিরাপদ হেফাজতে,' মুচকে হাসল পেলেড। মুখ ঘুরিয়ে চেস্ট অভ ড্রয়ারের দিকে তাকাল। 'কিছুই পেলে না কাঁচ ভাঙার মত? অবশ্য পেলেও লাভ হত না। ওটা রিইনফোর্ডস্ কাঁচ।'

'কি করে টের...' চট করে রুমের চারদিকে নজর বোলাল জেনি। তারপর চোখ গরম করে লোকটার দিকে তাকাল। 'ক্যামেরা বসানো আছে এ ঘরে?'

'অবশ্যই।' চোখ ইশারায় হ্যাণ্ড বেসিনের ওপর ফিট করা খুদে আয়না দেখাল পেলেড। 'ওটার পিছনে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলতে গেল জেনি, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। গোঙানি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

'এ দুটো খেয়ে নাও। ব্যথা কমে যাবে,' দুটো অ্যাসপিরিন এগিয়ে দিল লোকটা ওর দিকে।

'জাহান্নামে যাও!'

হাসল পেলেড। 'ওখানে আমাকে যেতে হলে সঙ্গে যে তোমাকেও নিতে হবে, জেনি।'

চোখের পানি সামলাতে পারল না এবার জেনি। 'কেন শুধু শুধু আমাকে আটকে রেখেছেন। কি ক্ষতি করেছি আমি আপনার?'

বেডসাইড টেবিলে ঢাকা দেয়া পানির গ্লাসের পাশে ট্যাবলেট দুটো

রেখে উঠে দাঁড়াল বেনি পেলেড। 'শুধু শুধু নয়। তুমি আমার ইনশিওরেন্স পলিসি, এই জন্যেই আটকে রেখেছি।'

'কিসের কথা বলছেন!' বিস্ময়ে কান্না ভুলে গেল জেনি। চোখ বড় করে চেয়ে আছে লোকটির দিকে। 'কিসের ইনশিওরেন্স?'

'শোনো, এ বিষয়ে যত কম জানবে, ততই তোমার জন্যে ভাল। ততই নিরাপদ থাকবে তুমি। সত্যি কথা বলছি, তুমি খুব ভাল মেয়ে। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। আমার হাতে তোমার কোন ক্ষতি হোক ভাবতেও কষ্ট হয় আমার। ওষুধ দুটো খেয়ে নাও। একটু সুস্থ হলে লাউঞ্জে চলে এসো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।' দরজা খুলে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা। ঘুরে মিষ্টি করে হাসল জেনির উদ্দেশে। 'আমার একটা বোন ছিল, জেনি। ঠিক তোমার মত দেখতে। বেঁচে নেই। তোমারই বয়সে ক্যান্সারে মারা গেছে। তোমার মাঝে আমি ওকে দেখতে পেয়েছি। এমন কিছু করার চেষ্টা কোরো না যাতে...।' কথাটা শেষ করল না পেলেড। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ এক টুকরো দোদুল্যমান হাসি ধরে ঘুরে দাঁড়াল। চলে গেল লাউঞ্জের দিকে। দরজা খোলাই থাকল।

পেলেডের কথাগুলো কানে গেল ঠিকই, কিন্তু মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছুল না জেনির। সামনে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে যেতেই খোলা দরজার দিকে পা বাড়াল ও। কিন্তু বের হওয়ার মুখে বাধা পেল, সভয়ে পিছিয়ে এল এক পা। সেই কালো লোকটা। দরজার আড়ালেই ছিল হয়তো, এগিয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। পেশীবহুল দু হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখা। হাসছে দাঁত বের করে।

লোকটির চাউনির মধ্যে লোভ রয়েছে, বুঝতে পারল জেনি। ধড়ফড় করতে আরম্ভ করল বুক। ঘুরে বেডসাইড টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও।

অ্যাসপিরিন দুটোর সঙ্গে গ্লাসের পুরো পানি শেষ করল। আতঙ্কে মাথার যন্ত্রণা অনেক কম মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। অমন ইতরের মত হাসছে কেন মানুষটা? কোন বদ্ মতলব নেই তো? কোথায় গেল জাকি হাদাদ?

এই সময় পেলেডের গলা শোনা গেল। 'ড্যানিয়েল!'

পিছনে পায়ের আওয়াজ উঠতে ঘুরে তাকাল জেনি। চলে গেছে লোকটা। ড্যানিয়েল। সাহস সঞ্চয় করে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও। ছোট একটা করিডরের ওপাশে বড় একটা রুম দেখা যাচ্ছে। পা টিপে টিপে এগোল জেনি। এটা সম্ভবত হলরুম। ফাঁকা। হাদাদ বা ড্যানিয়েল কাউকেই দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে।

হলরুমের ও প্রান্তের বন্ধ দরজাটার দিকে লোভীর দৃষ্টিতে তাকাল জেনি। নিশ্চয়ই ফ্রন্ট ডোর ওটা। তালা মারা? আরেকবার চকিতে নিজের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ও। কেউ নেই। অস্থির হয়ে উঠল জেনি। পলকে পৌঁছে গেল দরজার সামনে। আস্তে করে ইয়েল লকের নব ঘোরাল ও। গরম রক্ত ছলকে উঠল বুকের মধ্যে। খোলা!

নবটা পুরো ঘুরিয়েই দরজা টান দিল জেনি। খুলে গেল ওটা, কিন্তু মাত্র তিন-চার ইঞ্চি এগিয়েই আটকে গেল পাল্লা কিছুর সঙ্গে। শব্দ উঠল 'ঝনাৎ' করে। ঝড়ের বেগে নিজেকে গালাগাল দিতে শুরু করল মেয়েটি। কানী! সিকিউরিটি চেইন চোখে পড়েনি তোমার! পরক্ষণেই চমকে উঠল ও পেলেডের হাঁক শুনে।

'জেনি!' রুমের অন্য প্রান্তে লাউঞ্জের সংযোগ দরজায় উদয় হয়েছে লোকটা। পলকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই ছুটল সে মেয়েটিকে ধরার জন্যে।

তাকাল না জেনি আরনল্ড। মরিয়া প্রচেষ্টায় টানা হ্যাঁচড়া করে প্রায় খুলে এনেছে শিকল। লোকটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, এই সময় খসিয়ে

ফেলল জেনি ওটা। কিন্তু তখনই দরজা খুলল না। হঠাৎ করে কোত্থেকে এত সাহস ভর করল ওর কাঁধে কে জানে, অপেক্ষা করতে লাগল মোক্ষম মুহূর্তটির। ঝড়ের বেগে পৌঁছে গেল বেনি পেলেড। ডানদিক থেকে আসছে সে, দরজাও ডানদিকেই খোলে।

নব শক্ত মুঠোয় চেপে দরজা ধরে গায়ের জোরে হ্যাঁচকা টান মারল জেনি। প্লাইউডের পাল্লার ধারাল কোণা ছুটে গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল পেলেডের ডান ভুরুর ওপর। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, পলকে চিত হয়ে পড়ে গেল। দরজার বাইরে পা রাখার আগে ঘুরে তাকাল জেনি একবার। ডান হাত দিয়ে আঘাত পাওয়া জায়গাটা চেপে ধরে আচ্ছন্নের মত ওর দিকে চেয়ে আছে লোকটা। আঙুলের ফাঁক গলে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

ত্রস্ত হরিণীর মত লাফ দিল জেনি। দরজা লাগিয়ে দিয়েই ছুটল পোর্চ লক্ষ করে। মুহূর্তে সামনের খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল ও। ঘন জঙ্গলে ঘেরা বাড়িটা। চারদিকে মোটা কাণ্ডের আকাশছোঁয়া অজস্র গাছ, চাঁদের আবছা আলোয় নিথর দাঁড়িয়ে। গা ছম্ ছম্ করে উঠল জেনির। জঙ্গলের সীমানা শুরু হয়েছে বাড়ির শ দুয়েক গজ দূর থেকে। চারদিকেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল, কোন দিকে যাবে ঠিক করে উঠতে পারছে না জেনি।

পিছনের একজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ সচকিত করল ওকে। চোখ বুজে নাক বরাবর খিঁচে দৌড় আরম্ভ করল জেনি। ওরই মাঝে চকিতে পিছনে চাইল, উঁচু বারান্দা থেকে লাফিয়ে পোর্চে নেমে পড়েছে পেলেড। শার্টের ডান বুকের পুরোটা কালো দেখাচ্ছে, ভিজে গেছে রক্তে।

মুহূর্ত পরই ড্যানিয়েলকে দেখা গেল পেলেডের পাশে। একটা ওয়ালথার পি থ্রি-এইট তার হাতে। জেনিকে দমকা বাতাসের মত ছুটতে দেখে ঝট্ করে পিস্তল তুলল ড্যানিয়েল। সেফটি ক্যাচের মৃদু 'খুট্' শব্দে

যেন হুঁশ হলো পেলেডের, থাবা দিয়ে ড্যানিয়েলের হাতটা নামিয়ে দিল সে। 'সরাও পিস্তল!' খ্যাঁক করে উঠল বিরক্ত হয়ে।

'পালিয়ে যাচ্ছে যে!'

লোকটাকে পাত্তা দিল না পেলেড। জেনির উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'জেনি! দাঁড়াও! ওদিকে যেয়ো না!'

'আরেকটু গেলেই মরবে ছুঁড়ি,' গজগজ করতে লাগল ড্যানিয়েল। জেনি ততক্ষণে পৌঁছে গেছে প্রায় জঙ্গলের কিনারায়।

'জে-নি-ই-ই!' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পেলেড আবার। 'যেয়ো না। জঙ্গলে পশু ধরার ফাঁদ পাতা রয়েছে। ওতে পা পড়লে বাঁচবে না তুমি! যেয়ো না, জেনি! দাঁড়াও...থামো!'

কে শোনে কার কথা। গতি কমল না মেয়েটির একটুও। 'এখন কি করবেন, বস্?' জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

'ধরতে হবে ওকে! জলদি যাও, টর্চ নিয়ে এসো দুটো।' হাত তুলে শার্টের আস্তিনে রক্ত মুছল পেলেড। প্রচণ্ড আঘাতে প্রায় আধ ইঞ্চি সেঁধিয়ে গেছে দরজা ভুরুর মাংসে, লম্বালম্বি ভাবে। ব্যথায় টন্‌টন্ করছে জায়গাটা, অথচ মেয়েটির ওপর কেন যেন রাগ করতে পারছে না সে। উল্টে পশু ফাঁদের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছে। ওর একটায় পা ছোঁয়ালেই শেষ, জনমের মত খোঁড়া হয়ে যাবে জেনি। কেটে বাদ দিতে হবে সে পা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ড্যানিয়েল টর্চ নিয়ে। তারপর ছুটল দুজন। পেলেড সরাসরি জেনির পিছন পিছন। ড্যানিয়েল তার নির্দেশে কোণাকুণি। যদিও তার দৌড়ে তেমন জোর নেই। ফাঁদের ভয় চেপে বসেছে তার মনে। জেনির নয়, কল্পনায় নিজের মরণ দেখতে পাচ্ছে সে দিব্য চোখে। কিন্তু কিছু করার নেই। ভালই জানে সে, পেলেডের নির্দেশ অমান্য করার যে পরিণতি,

তারচেয়ে ওই ফাঁদও ঢের ঢের ভাল।

ওদিকে জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছে দম নেয়ার জন্যে একটু থামল জেনি। বনের ভেতর চাঁদের আলো ঢোকার উপায় নেই, চারদিকটা কালির মত কালো। কয়েক ফুটের ওপাশে সব অন্ধকার। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবছে জেনি, ফাঁদের ব্যাপারটা সত্যি হতে পারে না। ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে ওকে জাকি হাদাদ। নাকি সত্যি? একবার টিভিতে এক প্রামাণ্য চিত্রে দেখেছে জেনি এধরনের ফাঁদে পড়া পশুদের কী ভয়ানক পরিণতি হয়।

গলায় কি যেন একটা আটকে গেছে। উঠছে না, নামছেও না। আবার কান্না পেল জেনির। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ভয়ে। ওদিকে প্রায় এসে পড়েছে জাকি হাদাদ। আবছাভাবে তার ছুটন্ত কাঠামোটা দেখা যাচ্ছে। এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি করবে ও, দেরি করার উপায় নেই।

পালাবে জেনি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। কিছুতেই ধরা দেবে না আর খুনীটার হাতে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা লম্বা গাছের ডাল তুলে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর পা বাড়াল ও। ডালটা দিয়ে অন্ধের মত মাটি ঠুকে ঠুকে এগোতে লাগল এক পা দু পা করে। সেই প্রামাণ্য চিত্রে ফাঁদ পাতা জঙ্গলের ভেতর ঠিক এভাবেই পথ চলার কথা বলা হয়েছিল। এতে বিপদ যদি সামনে থেকে থাকে, তার ধাক্কা যাবে ডালের ওপর দিয়ে।

কিন্তু গজ পঞ্চাশেক এগিয়েই সাহস হারিয়ে ফেলল জেনি। আর পারছে না। পা উঠছে না। এর মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে ও। ধড়ফড় করছে বুক। একটা চওড়া গুঁড়ির ওপাশে আশ্রয় নিল জেনি। হাঁপাচ্ছে হাঁটু মুড়ে বসে। তবে শব্দ যাতে না হয় সে ব্যাপারে খুব সতর্ক। পেলেডের পায়ের শব্দ শোনার আশায় উৎকর্ণ। নেই। কোন আওয়াজ নেই। এমন কি গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। স্থির থাকতে না পেরে এক সময় মুখ বের

করে পিছনে উঁকি দিল জেনি। নাহ্! কিচ্ছু দেখার উপায় নেই অন্ধকারে।

আরেকটু নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করল জেনি। যেখানে বসে রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাবে নিশ্চিন্তে। আলো ফুটলে ওকে আর পায় কে! তবে যাই করো, সতর্কতার সঙ্গে কোরো, নিজেকে বোঝাল জেনি। জাকি হাদাদ প্রফেশনাল। তাকে বোকা বানানো সহজ হবে না। কিছুক্ষণ মূর্তির মত বসে থাকল জেনি, তারপর নিশ্চিত হলো এদিকে আসেনি লোকটা। অন্য কোনদিকে গেছে।

ডালটায় ভর দিয়ে উঠতে গেল জেনি, এমন সময় ওকে চমকে দিয়ে ডান দিকে একটা জোরাল আলো জ্বলে উঠল। টর্চলাইট! জমে গেল ও। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকল সেদিকে। নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইল গুঁড়ির সঙ্গে। মুহূর্তে চিকন ঘামে কপাল ভরে উঠল, কিন্তু তা মোছার সাহস হলো না। শুধু চোখ পিট পিট করে পাপড়িতে গড়িয়ে জমা হওয়া দু-তিন ফোঁটা ঝরাল অনেক কষ্টে। কয়েকবার এদিক-ওদিক করে নিভে গেল আলোটা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার হেঁকে উঠল পেলেড। 'জেনি!'

আবার চমকে উঠল ও। ডাকটা এল পিছন থেকে। কিন্তু টর্চলাইট জ্বলে উঠল ওর ডানে। তার মানে হাদাদের সঙ্গে সেই কালো মানুষটিও রয়েছে! দুজন দুদিক থেকে এগিয়ে আসছে? উঠে দাঁড়াল জেনি। এখানে বসে থাকলে ধরা পড়ে যাবে ও কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু তা হতে দিতে পারে না ও। বাঁ হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জেনি। তারপর ডাল ঠুকে ঠুকে বাঁ দিকে সরে যেতে আরম্ভ করল।

পায়ের তলায় শুকনো পাতা মুড়মুড় শব্দে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, শব্দ হচ্ছে বেশ। কিন্তু কিছু করার নেই। এটুকু ঝুঁকি না নিলে বাঁচা যাবে না। দশ-

বারো পা এগোতে সামনের দিকে কেমন সন্দেহজনক একটা আওয়াজ উঠল। ঝট করে বসে পড়ল জেনি আরেকটা গাছের আড়ালে। ঠিক সেই মুহূর্তেই দপ করে জ্বলে উঠল টর্চ লাইট। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল ও ধরা পড়ার হাত থেকে। দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত দেখে ফেলত।

কাছেই কোথাও চেঁচিয়ে উঠল ড্যানিয়েল। হিব্রুতে কি যেন বলল পেলেডের উদ্দেশে। পরক্ষণেই ধুপধাপ পদশব্দ শোনা গেল। দেখে ফেলেছে নাকি ওকে লোকটা? এদিকেই আসছে না? নাকি এসব করে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে ওকে, যাতে অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে জেনি? পায়ের শব্দ অনেক কাছে এসে পড়েছে। থেমে গেল। নিভে গেছে টর্চলাইট।

কোথায় লোকটা? জিভ বের করে খটখটে শুকনো ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করল জেনি। ঢোক গিলল। অসহ্য লাগছে নীরবতা। কোথায় গেল ব্যাটা? আছে, না সরে গেছে? গাছের গায়ে পিঠ ঘষে সামান্য বাঁয়ে এগোল জেনি, সন্তর্পণে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। নেই কেউ। অন্তত চোখে পড়ছে না।

এইবার বাঁ দিকে সতর্ক পায়ের আওয়াজ উঠল। এ নিশ্চয়ই হাদাদ, ভাবল জেনি। ওরা কি জেনে গেছে কোথায় আছে সে? আবার জ্বলে উঠল আলো, জেনির ত্রিশ গজ ডানে। খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি—জানে না। স্বস্তির পরশ বয়ে গেল দেহে। আরেকটু ভেতর দিকে সরে যেতে পারলে…।

'জেনি!'

যথাসম্ভব দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল মেয়েটি গভীর জঙ্গলের দিকে। ওদিকে আলোটা ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে। ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে একটু একটু করে। একেবারে আচমকা ওর বাঁ হাতটা চেপে ধরল কেউ। ভয়ে, আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জেনি আরনল্ড। ঝটকা মেরে

হাত ছুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ হলো না। আরও বরং শক্ত করে চেপে বসল মুঠি।

ওর মুখের ওপর জ্বলে উঠল আলো, পরক্ষণেই পেলেডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল উল্লসিত ড্যানিয়েল। কাজটা ভালয় ভালয় সারতে পেরে খুশি। আওয়াজটা সচকিত করে তুলল জেনিকে। বিনা যুদ্ধে ধরা দিই কেন! চিন্তা করল সে। হাতের ডালটা ঘুরিয়ে গায়ের জোরে আঘাত করল ড্যানিয়েলের বাঁ চোয়ালে।

কেঁউ করে উঠল লোকটা। অস্ত্র ছেড়ে চোয়াল চেপে ধরল। অসহ্য রাগে অন্য হাতে প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে বসল জেনির গালে। তিন পা পিছিয়ে গেল ও চড় খেয়ে, মাথা ঠুকে গেল গাছের সঙ্গে। আলো জ্বেলে ওয়ালথারটা খুঁজতে লাগল ড্যানিয়েল। কাছেই ঝরা পাতার ছোটখাট একটা স্তূপের ওপর পড়েছে ওটা, চিক চিক করে উঠল আলো লেগে। সেদিকে হাত বাড়াল ড্যানিয়েল।

স্তূপ ফুঁড়ে কি যেন একটা হঠাৎ উঠে এল বলে মনে হলো জেনির। পরক্ষণেই রোমহর্ষক ঠং ঠং আওয়াজ। নীরব জঙ্গল কেঁপে উঠল ড্যানিয়েলের বুক চেরা ভয়াবহ আর্তনাদে। ফাঁদে হাত দিয়ে ফেলেছে লোকটা। বড় বড় তীক্ষ্ণ ইস্পাতের দাঁত দুদিক থেকে কামড়ে ধরেছে হাতটা। ধড়মড় করে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল ড্যানিয়েল।

অন্য হাতে মরিয়া হয়ে টানাটানি করছে সে ফাঁদের চোয়াল খোলার জন্যে। কিন্তু একচুলও শিথিল হলো না শক্তিশালী ফাঁদ। বরং চামড়া ভেদ করে ভেতরে বসে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। বিরতিহীন চেঁচাচ্ছে লোকটা। ছুটে পালাবার আন্তরিক তাগিদ অনুভব করল জেনি। কিন্তু সামনের দৃশ্য চাক্ষুস করে সাহস হচ্ছে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এই সামান্য কয়েক সেকেণ্ডই যথেষ্ট

বেনি পেলেডের জন্যে। নির্ভয়ে ছুটে এল সে ঝড়ের গতিতে। আলো জ্বেলে ড্যানিয়েলের অবস্থা দেখল। তারপর মাথা দোলাল হতাশ ভঙ্গিতে।

'বাঁচান, বস্!' বহু কষ্টে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল লোকটা। 'প্লী-ই-জ। আর পারছি না।'

'দুঃখিত, বন্ধু। বিষ মাখানো ছিল ফাঁদের দাঁতে। মুক্ত করলে প্রচুর ভুগতে হবে তোমাকে, সেই সঙ্গে আমাকেও। এক সমস্যা নিয়েই…,' ইঙ্গিতে জেনিকে দেখাল পেলেড। 'তারচে' বরং…।' ডেজার্ট ঈগল তুলল সে ড্যানিয়েলের মাথা লক্ষ করে।

আতঙ্কে চোখ কপালে উঠল লোকটার। অবিশ্বাস মাখা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মারবেন না! বস্! আমাকে ছেড়ে দিন দয়া করে। আমি পালিয়ে যাব দূরে কোথাও…আমাকে…আমাকে…।' উন্মত্তের মত হাতটা মুক্ত করার জন্যে আবার টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল সে।

'পাগল!' পুরোপুরি নির্বিকার পেলেড। 'তাই কি হয়? এই-ই বরং ভালো।' ট্রিগার টেনে দিল সে।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ড্যানিয়েলের মাথা। কপাল ভেদ করে পিছনের খুলি প্রায় পুরোটাই উড়িয়ে নিয়ে গেল হেভি ক্যালিবার বুলেট। ঘুরে বসে গলগল করে বমি করে দিল জেনি। প্রতিটি দমকে পেটের নাড়ি-ভুঁড়িসুদ্ধ বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা দিয়ে।

মেয়েটিকে সুস্থির হওয়ার সময় দিল পেলেড। 'খেলা শেষ হয়েছে তোমার?' অটোমেটিকটা হোলস্টারে পুরল সে।

কোনরকমের মাথা দোলাল জেনি।

'চলো তাহলে,' ওর হাত ধরে টানল লোকটা। 'আর কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগেই কেটে পড়ি।'

আগের ছোট্ট রুমে এনে ঢোকাল সে জেনিকে। এক হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে হাতটা আটকে দিল খাটের পায়ার সঙ্গে। 'দুষ্টুমির শাস্তি।' রাগের আভাসমাত্র নেই লোকটির কণ্ঠে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল পেলেড। বাথরুমে এসে ঢুকল ক্ষতটার শুশ্রূষা করতে। আয়নায় আঘাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আঘাতের ফলে পুরো ডান চোখ এবং কপালের একদিক ফুলে উঠেছে। কালো হয়ে গেছে জায়গাটা। সকালের আগেই পুরোপুরি বুজে যাবে চোখ, ভাবল সে। ওয়াল কেবিনেট থেকে খানিকটা তুলো বের করে ভিজিয়ে নিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করার কাজে লাগল বেনি পেলেড। যতটা ভেবেছিল সে, তারচেয়ে অনেক গভীর হয়ে কেটেছে জায়গাটা।

হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে নিল সে। তারপর ক্যাবিনেট হাতড়ে এক শিশি ডিজইনফেকট্যান্ট এবং আরও খানিকটা তুলো বের করল। ওষুধে পুরোপুরি ভিজিয়ে নিয়ে তুলোটুকু ক্ষতের ওপর চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেল। সহ্য করে নিল পেলেড। মুখের একটা পেশীও কাঁপল না সামান্যতম।

কাজ সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে। গায়ের রক্তাক্ত শার্টটা খুলে নতুন একটা পরল। খাটের কিনারায় বসে কী যেন ভাবল একটু। তারপর উঠল পেলেড। একটা বালিশ খাটের হেডবোর্ডের সঙ্গে ঠেকিয়ে তার গায়ে হেলান দিয়ে বসে বেডসাইড টেবিল থেকে টেলিফোনটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে এল।

নিউ ইয়র্ক ফোন গাইডে লেখা নেই এটার নাম্বার। টপাটপ কয়েকটা সংখ্যা টিপল বেনি পেলেড—এ শহরেরই তালিকা বহির্ভূত আরেকটা

টেলিফোনের। রিঙ হচ্ছে। বসে থাকল সে ধৈর্যের সঙ্গে। রিসিভার তোলা হলো ও প্রান্তে। কিন্তু কোন সম্ভাষণ শোনা গেল না। নীরব লাইন। কেবল নিচু লয়ের শোঁ শোঁ শব্দ আসছে।

'লেপার্ড বলছি,' বলল পেলেড।

'আশ্চর্য!' কাঙ্ক্ষিত গলা ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে। রাগত স্বরে খেঁকিয়ে উঠল ফ্যালকন, 'ছিলে কোন্ জাহান্নামে! সেই কখন থেকে…কোত্থেকে ফোন করছ?'

'গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে সেফহাউস থেকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

'হোয়াট! কে তোমাকে ওখানে যাওয়ার অনুমতি দিল!'

'ওসবের সময় পেলাম কই? খুব তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে আমাকে। নাকি এখনও শোনেননি মারি হিলে কি ঘটেছে?'

'কি মনে হয় তোমার? সারা দেশ জেনে গেছে আর আমি জানব না? বাংলোটা ছিল আমাদের অন্যতম সেরা সেফহাউস, বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছ তুমি তার। এতগুলো মৃতদেহ…কি ঘটেছিল ওখানে! তাছাড়া ফিশারের নাতনী-ই বা এসবের মধ্যে কেন?'

ও প্রান্তের রাগ পেলেডের মধ্যেও সংক্রামিত হলো। কিন্তু নিজেকে সামাল দিল সে। কোনরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে জেনি-টোয়েন প্রসঙ্গ বিস্তারিত বলে গেল। সার্জেন্ট রজার্স ও বেইলির অকস্মাৎ আগমন এবং পরের ঘটনা বলল দায়সারা ভাবে।

'এবং তোমার এই পরিকল্পনার কথা আগে থেকে আমাকে জানাওনি কেন! মাই গড! তুমি দেখছি পুরো অপারেশনের বারোটা বাজাতে বসেছ।'

'প্রয়োজন মনে করিনি বলে জানাইনি,' কঠোর কণ্ঠে উত্তর দিল পেলেড। 'তবে এখন যখন জানতে চাইছেন, শুনুন, মেয়েটি হচ্ছে আমার

লাইফ ইনশিওরেন্স পলিসি। কাজ শেষ হওয়ার পর যাতে নির্বিঘ্নে সরে যেতে পারি, সে জন্যেই...'

প্রায় ধমক মেরে পেলেডকে থামিয়ে দিল ফ্যালকন। 'পাগলের প্রলাপ বকছ তুমি! ধরে নিয়েছ জেনিকে জিম্মি করতে পেরেছ বলে ইউনাকো চেয়ে চেয়ে তোমার পদক্ষেপ গুণবে? বাধা দেবে না? ওখানে যে রানা আছে ভুলে গেলে?'

'না, ভুলিনি। ওর জন্যেই তো আটক করেছি মেয়েটিকে।' সিধে হয়ে বসল পেলেড। 'আমরা কিন্তু আজেবাজে আলোচনায় সময় নষ্ট করছি। ওদের আমি ঠিকই সামাল দেব সময় হলে। ও নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'কেন চিন্তামুক্ত হতে পারছি না?' বিড়বিড় করে বলল ফ্যালকন।

'শুনুন, একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। সে জন্যেই ফোন করেছি।'

'কি সেটা?'

একটু আগে জেনির পালানোর চেষ্টা এবং ড্যানিয়েলের পরিণতির কথা ব্যাখা করল পেলেড। 'মেয়েটির জন্যে আরেকজন বেবিসিটার চাই আমার।'

'তাই নাকি?' বলার সুরে টিটকিরি প্রকাশ পেল ফ্যালকনের। 'কিন্তু এই সেইন্ট ড্যানিয়েল কোত্থেকে এলেন এর মধ্যে? তালিকায় নামটা ছিল বলে তো মনে পড়ছে না!'

'ঠিকই আছে,' দাঁতে দাঁত চাপল পেলেড। 'ছিল না। আমি একে অন্তর্ভুক্ত করেছি পরে টীমে। জিম্বালান স্কোয়াডের পঞ্চম সদস্য।'

'পঞ্চম? অথচ আমি জানতাম টীমে চারজন ছিল।'

'বললাম তো, আমি পরে অন্তর্ভুক্ত করেছি ড্যানিয়েলকে।'

'এসব করার তুমি কে হে? অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করা মাস্টার প্ল্যান নিজের ইচ্ছেমত ওলট-পালট করছ তুমি কাউকে না জানিয়েই। তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি, লেপার্ড, তুমি আমাদের হয়ে কাজ করছ। এবং কি তোমাকে করতে হবে না হবে, তা আমরাই নির্ধারণ করব। যা করেছ, করেছ। এরপর আমাদের অজ্ঞাতে একটা পা-ও ফেলবে না তুমি। পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার,' অনাগ্রহ প্রকাশ পেল পেলেডের কণ্ঠে। 'কিন্তু এখন একজন বেবিসিটারের ব্যবস্থা তো করুন আগে।'

'হবে না,' সোজা সাপ্টা জবাব ফ্যালকনের। 'সম্ভব নয়।'

এবার আর নিজেকে সামলাবার কোন চেষ্টাই করল না পেলেড। কড়া গলায় বলল, 'তাহলে আমার আশাও ছাড়তে হবে আপনাদের। আর কাউকে খুঁজে নিন,' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল সে।

মুহূর্ত পরই বেজে উঠল টেলিফোনটা। রিসিভার কানে লাগাল পেলেড। শীতল কণ্ঠে বলল, 'ইয়েস?'

'লেপার্ড?' ভীতিকর রকম থমথমে গলায় প্রশ্ন করল ফ্যালকন।

'হ্যাঁ।'

'আর কখনও এ ধরনের বেয়াদপি কোরো না আমার সঙ্গে। কক্‌খনও না। সহ্য করব না আমি।'

'তার মানে আমার প্রস্তাবে রাজি আপনি?' মনে মনে হাসছে পেলেড। এখন যদি ব্যাটাকে জানানো হয় টীমে আরও একজন অতিরিক্ত রয়েছে, রাগে ঠিক কাপড় ভিজিয়ে ফেলবে ব্যাটা

ওর প্রশ্নের উত্তর দিল না ফ্যালকন। তেতো গলায় বলল, 'কখন দরকার

লোক?'

'অপারেশনের দিন।'

'ঠিক আছে। পৌঁছে যাবে সময় মত।'

'ধন্যবাদ।'

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মনি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২১-১২-৯৩ তিন গোয়েন্দা (৫২, ৫৩, ৫৪) ভলিউম ১৪ রকিব হাসান
বিষয়ঃ কিশোর, মুসা আর রবিন তিন বন্ধু মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছে নামঃ তিন গোয়েন্দা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে পুরানো এক মোবাইল হোম-এ ওদের হেডকোয়ার্টার। এ ভলিউমে তিনটি রহস্যের সমাধান করবে ওরা। পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন।

২৩-১২-৯৩ প্রফেসর মাসুদ রানা (স্পাই থ্রিলার) কাজী শাহনূর হোসেন
বিষয়ঃ ইউরোপের ছোট্ট একটা দেশ যদি সুপার নিউক্লিয়ার বোমা বানিয়ে ফেলে তবে কি ঘটবে? মাসুদ রানা কি পারবে মানব জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে?

২৩-১২-৯৩ দুই নারী (অনুবাদ ঃ বড়দের জন্য) সিডনি শেলডন/মাসুদ মাহমুদ
বিষয়ঃ নোয়েল পাজ–অসাধারণ রূপসী এক নারী। পিতার হঠকারিতার কারণে কুমারিত্ব হারাল সে।...পাঠক, আসুন না দেখি কি করে ও!

আরও আসছে

২৫-১২-৯৩	ভিনগ্রহের মানুষ	(প্রজাপতি প্রকাশন)	রকিব হাসান
২৫-১২-৯৩	কোয়ানটাম মেথড	(প্রজাপতি প্রকাশন)	মহাজাতক
২৮-১২-৯৩	রহস্যপত্রিকা	(১০ বর্ষ ৩ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৯৪)	